শিক্ষার ভিত্তি

বনফুল

শিক্ষার ভিত্তি

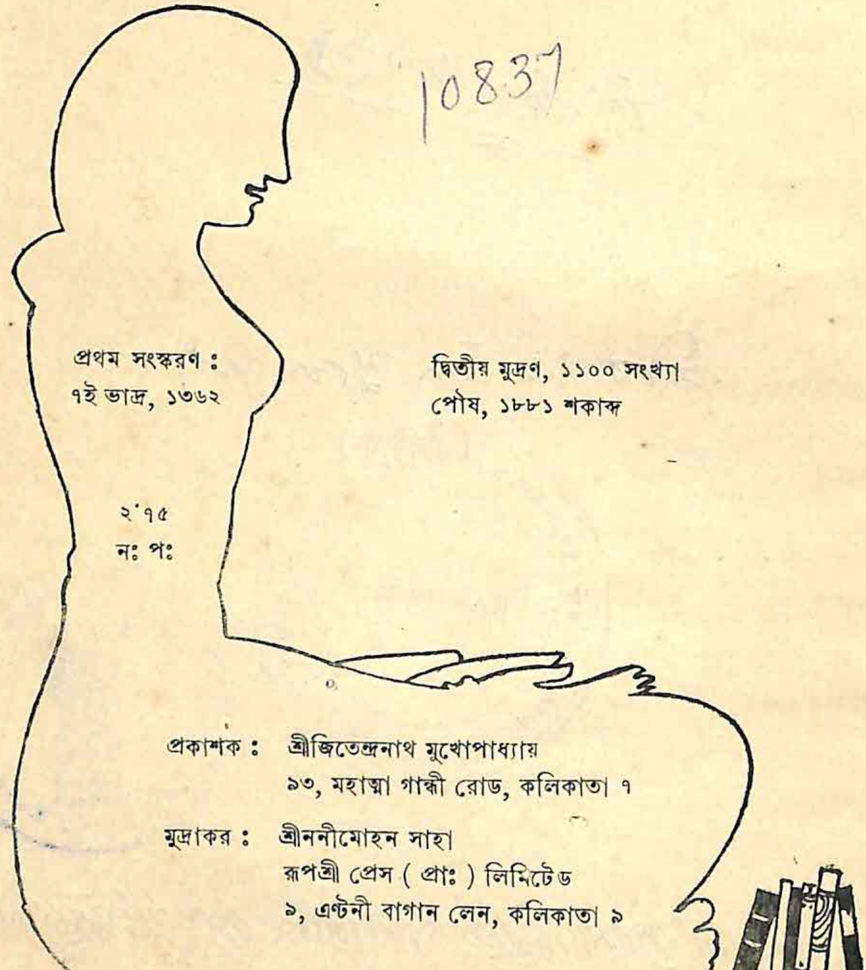
শিক্ষার ভিত্তি

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(বনফুল)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭



প্রথম সংস্করণ :
৭ই ভাদ্র, ১৩৬২

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১১০০ সংখ্যা
পৌষ, ১৮৮১ শকাব্দ

২·৭৫
নঃ পঃ

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

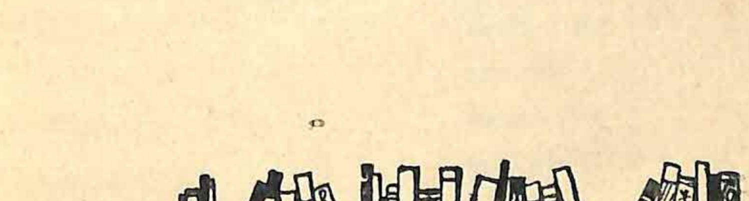
অধ্যাপক ডাক্তার

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি. লিট্.

শ্রীচরণেষু

ভাগলপুর

১০. ৫. ৫৫



*শিক্ষার ভিত্তি**

(এক)

সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের সহিত এই সভায় মিলিতে পারিয়াছি এই সামান্য ঘটনাটুকু মানবজাতির অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে অসামান্য বলিয়া মনে হইবে। একদা যে মানব-পশুরা দেখা হইলেই পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া নিজেদের শৌর্য প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত ছিল, কোন্ শিক্ষাবলে কিসের প্রেরণায় তাহারা মিলিত হইবার শক্তি লাভ করিল ? বস্তুতঃ মিলিত হইবার শক্তি অর্জন করিয়াই মানব প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে। নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে, নানা সুরে, নানা প্রয়োজনে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই মিলনের সাধনা করিয়াছে এবং অবশেষে এমন এক মিলনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে যাহা সুলভ নহে, যাহা সভা-সমিতিতে মেলে না, যাহা তপস্যাসাধ্য। ইহার জন্য কবি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তপস্বী কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন। এই মিলনের নাম কেহ দিয়াছেন মুক্তি, কেহ নির্বাণ, কেহ পরম মিলন, কেহ উপলব্ধি। এই মিলনের আগ্রহ যখনই যাহার মনে জাগে তখনই এই বাহিরের বিশ্ব, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক প্রয়োজনের উপকরণ-সম্ভার তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়, এমন কি অনেক সময় বাধাও মনে হয়। সর্ব দেশের শ্রেষ্ঠ মানব-মনীষা যে মিলনের জন্য সাধনা করিয়াছেন তাহা বহুর সহিত মিলন নয়, তাহা একের সহিত মিলন। তাহা

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি বক্তৃতা'

সত্যের সহিত মিলন। কথাটা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যে মিলনের বাসনা একদিন বহুলোককে একত্রিত করিয়াছিল সেই মিলনের যখন চরম অভিব্যক্তি ঘটিল, তখন তাহা হইতে 'বহু'টা বাদ পড়িয়া গেল। শ্রেষ্ঠ মনীষা তখন বহুর মধ্যে সেই এককে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন যাহা শাশ্বত, যাহা অবিনশ্বর, যাহা বন্দী করে না, যাহা মুক্তি দেয়। মানবের মধ্যে যতক্ষণ পশু প্রবল থাকে ততক্ষণ তাহার বিভিন্ন সামাজিক প্রচেষ্টা তাহাকে যে ভোগ-স্বর্গ রচনায় প্রবৃত্ত করে, তাহার মনীষা আর একটু উন্নত হইলেই সেই স্বর্গ কারাগারে পরিণত হয়।

আমরা অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। এই মিলনের প্রকৃত মর্ম আমাদের অনেকেরই নাগালের বাহিরে। আমরা অনেকের সহিত মিলিত হইয়াই আনন্দ লাভ করিতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে আনন্দ লাভ করিতে পারি কি? আমরা হাটে-বাজারে মিলি, সভা-সমিতিতে মিলি, ট্রেনে-জাহাজে মিলি, ধর্মক্ষেত্রে মিলি, রাজনীতিক্ষেত্রে মিলি, সাহিত্যক্ষেত্রে মিলি, বিদ্যামন্দিরে মিলি। মিলনের নানা ক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু মিলনের প্রকৃত আনন্দ আমরা লাভ করিতেছি কি? আমাদের জীবন কি আনন্দময়, শান্তিময়? যদি সত্যকথা বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে—না আমরা সুখী নই, আমাদের জীবন আনন্দহীন, অশান্তিপূর্ণ। আমরা বাহিরে একটা সুখের ভান করিতেছি মাত্র, ভিতরটা আমাদের পুড়িয়া যাইতেছে; যখন আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটাও পড়িতেছে তখনও আমরা দন্ত বিকশিত করিয়া বলিতেছি—চমৎকার লাগিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তো বটেই, আমাদের ধর্মক্ষেত্রেও এই ভান, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাই, সর্বত্রই আমরা মুখোশ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মুখোশের প্রয়োজনে কাঁদিতেছি, হাসিতেছি, অপমানিত বা সম্মানিত হইতেছি। ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর নিকটও সর্বতোভাবে হৃদয় উন্মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

তাই আমাদের শিক্ষার কথা যখনই চিন্তা করি তখনই মনে হয় —শান্তি এবং আনন্দই যদি জীবনের কাম্য হয় তাহা হইলে শিক্ষার বনিয়াদটা কিরূপ হওয়া উচিত ? আর একটা প্রশ্নও মনে জাগে— শিক্ষার লক্ষ্য আত্মবিকাশ, না, সামাজিক উন্নতি ? প্রতিটি ব্যক্তিকে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলেই যে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে এমন কোন কথা নাই। সমগ্রভাবে সমাজের উন্নতি ঘটিলে প্রতিটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যে সম্যক-রূপে সম্মানিত হইবে না, ইতিহাসেই তাহার বহু প্রমাণ আছে। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি আধুনিক সমাজে টিঁকিয়া থাকিতে পারেন নাই—সক্রেটিস্, জোয়ান অব আর্ক, পদ্মিনী, রাণা প্রতাপ, নেপোলিয়ন, লেনিন, মহারাজ নন্দকুমার, বাঙলাদেশের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বীরেরা, মহাত্মা গান্ধী, আব্রাহাম লিংকন্, এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে। ব্যক্তির সহিত সমাজের বিরোধ যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সমাধান না করিতে পারিলে শান্তির আশা নাই। এ সমস্যা যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, কারণ শত শত শতাব্দীর তথাকথিত শিক্ষা অধিকাংশ মানুষের পশুত্বকেই নূতন পরিচ্ছদ পরাইয়াছে। এখনও মানবসমাজের অধিকাংশ লোকই পশু-স্তরের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। বস্তুবিজ্ঞান চর্চার ফলে যে প্রগতি আমরা অর্জন করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য এই পশুত্বেরই প্রসাধন ও বিনোদন, এতদপেক্ষা মহত্তর কোনও লক্ষ্যে সমগ্রভাবে এখনও আমরা পৌঁছিতে পারি নাই। বিজ্ঞানচর্চার আদি ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা নির্বিঘ্নে পশুজীবন যাপন করিবার জন্যই একদা সমাজ স্থাপন করিয়াছিল এবং সেই সমাজের সুখসুবিধা বর্ধনের জন্যই বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। সেই অতীত যুগেও ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ছিল। যে কোনও দ্বন্দ্বে শক্তিরই জয় হয়। সে সমাজেও যাহারা বুদ্ধিমান শক্তিমান ছিল তাহারা দলপতি, যাদুকর, চিকিৎসক, পুরোহিত প্রভৃতি হইয়া

অন্য সকলের উপর আধিপত্য করিত। এই যাদুকর পুরোহিতের দলই কালক্রমে সমাজপতি, দিগ্বিজয়ী বীর, রাজা-মহারাজা-সম্রাট-ফারাও, সিজার-জার-ডিক্‌টেটারে রূপান্তরিত হইয়া দীর্ঘকাল মানব-সমাজকে শাসন করিয়াছে, এখনও করিতেছে। এখন নামটা শুধু বদলাইয়াছে, সাধারণ লোককে সাময়িক ভাবে মুগ্ধ অথবা সন্ত্রস্ত করিবার মন্ত্রেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে; মূল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তেমনই আছে। ডেমোক্র্যাসিও বহুর উপর কয়েকটিমাত্র লোকের আধিপত্য ছাড়া কিছু নয়। জনগণ যেসব ব্যক্তিকে শাসনকর্তারূপে নির্বাচন করেন তাঁহারা সব সময়ে নির্বাচন-যোগ্য ব্যক্তিও নহেন, নানারূপ কায়দা-কৌশল করিয়া শক্তি ও বুদ্ধির নানাবিধ জটিল জাল সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা নির্বাচিত হন।

এই সব আধিপত্যকে মানুষ কিছুদিন মানিয়া লইতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু এ জাতীয় আধিপত্যে সে সুখে থাকে না। তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত ইহার অহরহ বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের ফলে হয় সে পরাজিত হয়, না হয় বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতির ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া অবাঞ্ছিত আধিপত্যের অবসান ঘটায়। ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের দ্বন্দ্ব আমাদের অশান্তির একটা প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে? ব্যক্তিত্বকে নিষ্পিষ্ট করিয়া একরঙা একটা সমাজ স্থাপন করাই কি আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হইবে? না, প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আমরা শিক্ষার আয়োজন করিব? ব্যক্তি ও সমাজের ঐক্য ঘটিলেই কি শান্তি সুলভ হইবে? এসব সমস্যা আলোচনা করিবার পূর্বে ব্যক্তিত্ব জিনিসটা কি তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রতিটি মানুষই একটি বিশেষ সত্তা, আলাদা জগৎ। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাকে দ্বিবিধ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। প্রথম সংগ্রাম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে। এ সংগ্রাম জীবন-মরণ সংগ্রাম। এ সংগ্রামে পরাজয় মানে মৃত্যু। তাহার দ্বিতীয় সংগ্রাম সামাজিক

পরিবেশের সঙ্গে। এই উভয়বিধ কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা সে মাতৃজঠর হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনে। শুধু পিতামাতার নয়, বিস্মৃত পূর্বপুরুষদের যোগ্যতা অযোগ্যতা শক্তি দুর্বলতারও উত্তরাধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। যে বংশে তাহার জন্ম, দেহে মনে চরিত্রে সেই বংশের ছাপ লইয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এই ছাপ এড়াইবার উপায় নাই—আমড়ার বীজ হইতে আমড়াগাছ হইবে, আম বা আপেলগাছ হইবে না ; অ্যালসেশিয়ান দম্পতীর বংশে অ্যালসেশিয়ানই জন্মিবে, বুলডগ্ জন্মিবে না। বংশের বৈশিষ্ট্য লইয়াই প্রত্যেককে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার এই উত্তরাধিকার বিনষ্ট হইতে পারে, সমৃদ্ধ হইতে পারে, ঈষৎ পরিবর্তিত হইতে পারে, কিংবা যেমন ছিল তেমনি থাকিতে পারে। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের প্রভাব অতিক্রম করিবার উপায় নাই। জুঁইগাছে গোলাপ কখনও ফুটিবে না। একদল বিজ্ঞানী অবশ্য বলেন যে, শিক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাবে বংশ-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব ; কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এ বিশ্বাস পোষণ করেন না, কারণ পরীক্ষাদ্বারা তাহা সমর্থিত হয় নাই। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, বংশের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নয়। হয়তো ইহাই প্রালব্ধ বা fate ; এই প্রালব্ধ প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র। বিচিত্র উপায়ে প্রতিটি প্রাণী এই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। সহোদর ভ্রাতাভগ্নীরাও বংশের উত্তরাধিকার সমভাবে লাভ করে না, কারণ যে genes পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া জন্মকালে ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাহারা প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রতিবারই বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাহক হয়, প্রতিবারই তাহাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য এবং স্বাতন্ত্র্য থাকে। তাই সহোদর ভ্রাতাভগ্নীদের ভিতর স্বাতন্ত্র্য ও সাদৃশ্য দুইই প্রতীয়মান। যমজরাও সম্পূর্ণরূপে এক নয়, তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে।

এইরূপ এক একটি বিশিষ্ট সত্তা লইয়া আমরা প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করি সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। সমাজ ও প্রকৃতি আবার প্রত্যেকটি সত্তাকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফেলিয়া নূতন রূপ দান করে। একই কাদার তাল কেহ হয় হাঁড়ি, কেহ হয় সরা, কেহ হয় মূর্তি। মানব-সমাজের যত বয়স বাড়িতেছে, আমাদের তথাকথিত সভ্যতার জটিলতাও তত বাড়িতেছে এবং প্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আরও জটিল, আরও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। মনঃসমীক্ষণ করিয়া মানবমনের বিভিন্ন স্তরের যেসব খবর সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড আমাদের দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর এবং আতঙ্কজনক। প্রতিটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা-অক্ষমতা, রুচি-আদর্শ, ন্যায়-অন্যায়বোধ এত বিভিন্ন, এত বিচিত্র, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে এত স্বতন্ত্র যে কোনও একটি বাঁধাধরা নিয়মাবলীর খাঁচায় সুখেশান্তিতে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তি আপনার স্বতন্ত্র কল্পনায় মনে মনে এক একটি আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করিয়া রাখে এবং বাস্তবে তাহা মূর্ত দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করে। সে, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেই অশান্তি। এই অশান্তির চিহ্ন আমরা সমাজে সর্বদা নানাভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্তমানের নিন্দায় সকলেই পঞ্চমুখ। কেহ অতীতের দিকে চাহিয়া হা-হুতাশ করিতেছেন, ভবিষ্যৎকে মনোমত করিয়া গড়িবার জন্য কেহ বৈধ, কেহ বা অবৈধ উপায় অবলম্বনে উদ্যত, অনেকে আবার মনের প্রবল ভাবসমূহকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া মানসিক রোগাক্রান্ত হইয়াছেন।

অশান্তি দূর করাই যদি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এই সব বিষয়ে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যদৃচ্ছভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ দিলেও কিন্তু শান্তির আশা নাই। কারণ প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব যদি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে চায়, সমাজের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, এবং সমাজের অস্তিত্ব না থাকিলে সাধারণ মানুষ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে

না। তুই একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়তো পারিবেন। শান্তিলাভের আশাতেই সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির সহায়তা লাভ করিবার জন্য আমরা ব্যক্তিগত সুখ খানিকটা বিসর্জন দিই, কিন্তু মুশকিল হইয়াছে বিসর্জন দিয়া সুখী হই না। ব্যাপারটা অনেকটা যেন tax দেওয়ার মতো হইয়া দাঁড়ায়। এই অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই স্বার্থবিসর্জনের বিনিময়ে যে পরিমাণ সুখসুবিধা লোকে প্রত্যাশা করে সে পরিমাণ সুখসুবিধা তাহারা পায় না। মিউনিসিপ্যালিটিতে আমিও tax দিই, মিউনিসিপ্যালিটির মেয়রও দেন। আমার বাড়ির সম্মুখস্থ রাস্তা কিন্তু মেরামত হয় না, নালা পরিষ্কার হয় না, মেয়রের বাড়ির চতুর্দিক কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তখন মন বিষাইয়া ওঠে এবং সুযোগ পাইলে নিজেই মেয়র হইবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইলে অশান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়! সমাজের ব্যাপারেও ঠিক অনুরূপ পুনরাবৃত্তি হয়। সমাজেও দেখি কয়েকটি বিশেষ ধরনের লোক বিশেষ নীতি বা কৌশল অবলম্বন করিয়া বেশি সুবিধা লাভ করিতেছেন। অধিকাংশ লোকই তখন সেই বিশেষ কৌশল বা নীতি আয়ত্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন। বর্তমান যুগে তো বটেই, অতীতের পুরাণ-ইতিহাসেও ইহার বহু প্রমাণ মিলিবে। পুরাণের গল্পে দেখি দানবেরা দেবত্ব লাভের জন্য সমুৎসুক, ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য লোলুপ, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র হইতেছেন, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম-বুদ্ধ হইয়া ধর্ম-প্রচার করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম যখন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল তখন দেখি বেদপন্থীরা দলে দলে বৌদ্ধ হইতেছেন, বৌদ্ধধর্ম যখন অধঃপতিত হইল মুসলমানরা আসিলেন, তখন দেখিলাম এই বৌদ্ধরাই আবার ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছেন। মুসলমান রাজত্বের অবসানে আমাদের দেশে যখন ইংরেজের আগমন ঘটিল তখন আমরা মুৎসুদ্দি হইলাম, খ্রীষ্টান হইলাম, ইয়ং বেঙ্গল হইলাম ওই একই প্রেরণায়। তাহার পর কেরানিকুল সৃষ্টি করিবার

জন্য যখন এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হইল—যে শিক্ষার মূলমন্ত্রটি বাঙালীর ছড়ায় আজও অমর হইয়া আছে—'লেখাপড়া শেখে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই'—তখন আমাদের মনে এই ধারণাটা পুরাপুরি বসিয়া গেল যে অর্থোপার্জনের জন্যই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, শিক্ষার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। এই অর্থকরী শিক্ষার রূপও যখন যেমন বদলাইয়াছে আমরাও তখনই তেমনি ঝুঁকিয়াছি। প্রথম যুগে যখন কয়েকটা ইংরাজি শব্দ জানিলেই চাকুরি মিলিত তখন আমরা ডিকশনারি মুখস্থ করিতেও ইতস্তত করি নাই। তাহার পর আসিল ডিগ্রীর যুগ, ধুয়া উঠিল কোনক্রমে বি. এ. পাশ করিলেই জীবনসমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, আমরা দলে দলে গ্র্যাজুয়েট হইলাম। তাহার পর ঝোঁক পড়িল আইন-শিক্ষার উপর, চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার উপর, টেকনিকাল শিক্ষার উপর। পূর্বে আমরা কেরানি, হাকিম, অধ্যাপক হইয়াছিলাম, এইবার দলে দলে উকিল, ডাক্তার ও এন্‌জিনিয়ার হইতে লাগিলাম, দেশী ডিগ্রীর উপর বিলাতি ডিগ্রীর অলঙ্কার চড়াইয়া সামাজিক পশার-প্রতিপত্তিও বাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মনে হইতেছে এ মোহও কাটিয়া আসিতেছে। এখন আরম্ভ হইয়াছে হিন্দী শিখিয়া নেতা এবং আধ্যাত্মিক ভেল্‌কি দেখাইয়া গুরু হইবার যুগ। দেখা যাইতেছে এ বাজারে রাজনৈতিক নেতা অথবা আধ্যাত্মিক গুরু হইতে পারিলে নানাপ্রকার সুখসুবিধা পাওয়া যায়।

অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, আধিভৌতিক সুখ-সুবিধার জন্য যুগে যুগে আমরা নানারঙের আলেয়া অথবা নানা ঢঙের মরীচিকার পিছনে ছুটিতেছি, কিন্তু আমাদের সুখও মিলিতেছে না, শান্তিও নাই। এই অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যে আজই আবির্ভূত হইয়া আমাদের দগ্ধ করিতেছে তাহা নয়, এ আগুন বরাবরই আছে। একটা হালের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। ১৩০৬ সালে—চুয়ান্ন বৎসর পূর্বে—যে কালের দিকে চাহিয়া আমরা এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া

বলিয়া থাকি,—"আহা, সে সময় কি সুখই ছিল"—সেই সময় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "আমাদের সমাজে একটা নৈরাশ্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমরা বড় একটা আশায় বুক বাঁধিয়া এতকাল আশ্বস্ত ছিলাম, যেন সে আশা আমাদের চূর্ণ হইয়াছে। আমরা এতদিন ধরিয়া যাহার মুখ চাহিয়া ছিলাম সে যেন আমাদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অতৃপ্ত বাসনার আর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিষাদধ্বনি কোথাও অস্ফুটভাবে কোথাও পরিস্ফুটভাবে সমুদ্গত হইতেছে। এই আকালিক বিষাদের, এই নৈরাশ্যের মূল কি?" বলা বাহুল্য, এই নৈরাশ্যের মূল কারণ ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধ। আমরা অশান্তি যে কেবল সজ্ঞানে ভোগ করিতেছি তাহা নহে, আমাদের নির্জ্ঞান মনও নানারূপ অশান্তির হেতুকে আত্মসাৎ করিয়া নানাভাবে ভারাক্রান্ত হইতেছে। আধিভৌতিক অভাবও এই অশান্তির একমাত্র কারণ নহে। সমাজে এমন লোক মোটেই বিরল নহেন যাঁহাদের কোনও অভাব নাই, যাঁহারা যশস্বী, ধনী, পদস্থ কিন্তু যাঁহাদের জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ। পারিপার্শ্বিকের সহিত কেহই যেন খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিতেছি না, প্রত্যেকেই যেন কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি।

সমাজের ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তিকে খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা সমাজ-পত্তনের কিছুকাল পরেই আরম্ভ হইয়াছে। সমাজপতি ও রাষ্ট্রনেতারা অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন ব্যক্তির সহিত সমাজ বা রাষ্ট্র একমত না হইলে সে সমাজ বা রাষ্ট্র বেশিদিন টেকে না। এই খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা মুখ্যতঃ দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। একদল সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দিয়া ব্যক্তিকে তদনুসারে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া সমাজ-চেতনা, রাষ্ট্রচেতনা অথবা বিশেষ-কোনও-উদ্দেশ্য-চেতনাকে প্রাধান্য

দিয়াছেন; তজ্জন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন; একজন নিয়ন্তার নির্দেশে সমস্ত সমাজ বা রাষ্ট্র ক্রীতদাসের মতো কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয়দল ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মতানুসারে গঠন করিতে চাহিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট লিংকনের ভাষায় এই দলের আদর্শ—Government of the people, by the people, for the people. কিন্তু কোনও ব্যবস্থাতেই ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের সুখশান্তি পাওয়া যায় নাই। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ক্রমশঃ যেন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে আমরা যেন ক্রীতদাস ছাড়া কিছু নই, আমাদের মালিকরা আমাদের কপালে যেন Free Citizen এই লেবেলটা নিজেদের আত্মপ্রসাদের জন্য কেবল আঁটিয়া দিয়াছেন। বহুকাল পূর্বে সমাজে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ধনীরা টাকা দিয়া বাজার হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দাসদাসীও কিনিয়া আনিতেন। মানবতার শোচনীয় অপমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া আমরা এ প্রথা অবলুপ্ত করিয়াছি। এখন কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙিয়াছে, এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে যন্ত্রসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই দাস-প্রথা নব-কলেবরে আবির্ভূত হইয়া আমাদের মানসিক শান্তি হরণ করিয়াছে, আমাদের আত্মসম্মানও আর নাই। সেই প্রাচীনকালের ক্রীতদাস অপেক্ষাও আমরা যেন বেশি অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় আমরা কেহই আর সুস্থ সবল প্রাণরসে সঞ্জীবিত স্বাধীনচেতা মানব নহি, আমরা একাধিক যন্ত্রের এবং যন্ত্র-নায়কের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। এই যন্ত্র আমাদের শক্তি, স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান, সমাজ, সম্পদ সমস্ত নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্যটুকুও আমাদের নাই, আমাদের বুদ্ধিও বিকৃত হইয়াছে, যান্ত্রিক অত্যাচারের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করিয়া আস্ফালনও আমরা করিতেছি বটে, কিন্তু নির্জ্ঞান মন এই সব

অপমান ক্ষোভ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে এবং আমাদের নানারূপ উৎকট অভব্য অসঙ্গত আচরণে তাহা প্রায়শঃই প্রকাশিত হইতেছে। পুরাতন দাস-প্রথা যেমন নূতন রূপে আসিয়াছে, যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে আমাদের পুরাতন সমাজও তেমনি নব-রূপ ধারণ করিয়াছে। কবি Cowper বলিয়াছেন—Man in society is like a flower blown in its native bud. এ-রকম সমাজ আমাদেরও হয়তো একদিন ছিল কিন্তু এখন আর নাই। আমাদের সে সমাজ ছিল পল্লীতে, সে সমাজের কিছু কিছু আভাস প্রবীণ লেখকদের লেখা হইতে পাই। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীনেন্দ্রনাথ রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাতে সে সমাজের রমণীয় চিত্র আঁকা আছে। শরৎচন্দ্র যে পল্লীসমাজের ছবি আঁকিয়াছেন তাহারও বাহিরের রূপটা বদলাইয়া গিয়াছে। প্রকৃত সমাজ বলিতে যাহা বোঝায় সে সমাজ বহুপূর্বেই অবলুপ্ত হইয়াছে। এখন সমাজপতি নাই, সামাজিক নিয়মও কেহ মানে না। দশবিধ সংস্কারের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এমন কি, বিবাহও আজকাল সামাজিক নিয়মে নিষ্পন্ন হয় না, বয়স্ক যুবকদের খেয়ালখুশী অনুসারে হয় এবং প্রায়শঃই নিয়ন্ত্রিত হয় আর্থিক মানদণ্ডে। তথাকথিত সভ্যসমাজে কিশোরী কন্যার বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মনুর বিধান বহুপূর্বেই অচল হইয়াছে। বয়স্ক যুবকেরা বিবাহ করিতে চান না, কিন্তু তাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া যান নাই। বিবাহ করিলে যে সব সুখ-সুবিধা-আনন্দ পাওয়া যায় তাহা তাঁহারা কোনও দায়িত্ব বহন না করিয়াই উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছেন। আমরা প্রতিবেশীর খবর রাখা আজকাল প্রয়োজন মনে করি না। প্রতিবেশীও আমাদের খবর রাখা অনেক সময় অপছন্দ করেন। যে সব ছোটখাটো সামাজিক উৎসব পুরাকালে আমাদের পরস্পরকে নানা বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিত সে সব উৎসব সভ্যসমাজ হইতে ক্রমশঃ

উঠিয়া যাইতেছে। যে সব দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বে আমরা মিলিত হইতাম সে সব দেবতা এখন অন্তর্হিত, বহু হিন্দুঘরে আজকাল ঠাকুরঘর পর্যন্ত নাই। কয়েকটি উৎসব এখনও অবশ্য সাড়ম্বরে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেগুলিতে সামাজিকতার কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। দেখি অহঙ্কারের আস্ফালন, টাকার মহিমা, দরিদ্রের সঙ্কুচিত অপ্রতিভতা, পরশ্রীকাতর অক্ষমের ক্ষোভ ; দেখি অকারণ অপব্যয়, অশ্লীল উন্মাদনা, অসংযত আচরণ। বহুকাল পূর্বে বড় দুঃখে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে লিখিয়াছিলাম—

"দিবসে নিশীথে যাহার স্বপ্ন
তন্ময় চিতে নিত্য হেরি,
ওঠে জয়গান জগৎ জুড়িয়া
যাহার দীপ্ত মূরতি ঘেরি,
যাহার পূজায় কত বলিদান,
কত না আরতি, মন্ত্র কত,
কত ঋত্বিক, কত পুরোহিত,
কত আয়োজন লক্ষ শত,
আকার তাহার যেমনই হউক
নানাভাবে করি টাকারই পূজা,
হোক না তাহার যেমন চেহারা—
বংশীবদন বা দশভুজা।
অয়ি মৃন্ময়ি অতসী-বরণি,
ভিখারী-ঘরনি শিবানি, অয়ি,
রূপার তলায় চাপা পড়ে গেছ,
তোমার পূজার মন্ত্র কই ?

টাকার পূজায় মত্ত সবাই—
তোমার পূজাও টাকার পূজা,

লক্ষ্য নহ গো উপলক্ষ্যই,
ওগো মৃন্ময়ি, হে দশভুজা।

সুদখোর ওই হারু-পোদ্দার
বাড়িতে তাহার পূজার ধুম,
গর্জন করে লাউডস্পীকার—
পাড়ার লোকের নাহিক ঘুম।

তাহার নিকট কর্জ করিয়া
পূজার বাজার করেছি সব,
অর্থ নহিলে জমে কি, জননি,
তোমার পূজার এ উৎসব ?

অর্থ পুড়িছে আতসবাজীতে,
আলোক মালায় জ্বলিছে টাকা,
ঘণ্টার রবে টাকাই বাজিছে—
প্রণাম না করে যায় কি থাকা ?

বড় সাহেবেরে সেলাম বাজাই,
রাজারাজড়ায় প্রণাম করি,
হারুর বাড়িতে তেমনি, জননি,
তোমারেও নমি, হে শঙ্করি।

অর্থাৎ কিনা হারুকেই নমি
কারণ তাহার টাকা যে আছে,
দুর্গা কৃষ্ণ যাই সে পূজিবে
আমরা নমিব তাহারই কাছে।"

দুর্গাপূজায় তিনদিন ধরিয়া অনাবিল আনন্দে ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে এখন আর আমরা মিলিতে পারি না। সকলে পাশাপাশি বসিয়া এক পূজামণ্ডপে মায়ের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হই না। গ্রামের

পুরোহিত, গ্রামের শিল্পী, গ্রামের গোয়ালা, গ্রামের ময়রা, গ্রামের কবিরা সে পূজায় অংশ লইবার সুযোগ পায় না। ট্রেনে বা এরোপ্লেনে করিয়া আমরা কাশী হইতে পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে মিষ্টান্ন ও প্রতিমা, শান্তিনিকেতন অথবা বোম্বাই হইতে গায়ক-গায়িকা আমদানি করি এবং তাহা অসম্ভব হইলে রেকর্ড বাজাই। যন্ত্রসভ্যতা আমাদের গ্রামকে ধ্বংস করিয়াছে। সে গ্রাম আর নাই, সে গ্রাম্য সমাজও আর নাই। গ্রামের ধনীরা আজকাল শহরে আসিয়াছেন। গ্রামে তাঁহারা গণ্যমান্য ছিলেন, শহরে তাঁহারা নগণ্য, তবু আসিয়াছেন। সুযোগ পাইলে অনেকে ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছেন।

যন্ত্রসভ্যতা আমাদের প্রাচীন সমাজের মাধুর্যকে অবলুপ্ত করিয়াছে কিন্তু ভিতরের গলদগুলিকে দূর করিতে পারে নাই; পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা এখনও ঠিক তেমনি আছে, যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে তাহার বাহিরের ঢংটা কেবল বদলাইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ নাই, কিন্তু খবরের কাগজ আছে, ক্লাব আছে, পার্টি আছে, সভা-সমিতি আছে এবং ইহাদের মধ্যে বেণী ঘোষালরাও আছেন। পরনিন্দা পরচর্চা এখন পল্লীসমাজেই নিবদ্ধ নাই, তাহা বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। আমরা প্রতিবেশীর খবর রাখি না কিন্তু কোরিয়ার খবর রাখি, আমেরিকা ইংলণ্ডের খবর রাখি, চীনের রুশিয়ার খবর রাখি, ফরেন পলিসি লইয়া উত্তপ্ত আলোচনা করি। গ্রামের বা স্বদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প বা শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা আমাদের ততটা লজ্জিত করে না কিন্তু বিদেশী সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বা শাস্ত্র সম্বন্ধে দুই চারিটা বুক্‌নি ছাড়িতে না পারিলে বর্তমান সভ্যসমাজে অপাংক্তেয় হইতে হয়। বুক্‌নি সংগ্রহ করিবার সুযোগও আজকাল মেলে, আজকাল প্রকৃত পণ্ডিত দুর্লভ কিন্তু পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের অভাব নাই।

অর্থাৎ যন্ত্রসভ্যতা আমাদের সমাজের বাহিরের রূপটা বিনষ্ট

করিয়াছে, কিন্তু আমাদের চিত্তকে উন্নত করিতে পারে নাই, বরং তাহা নীচাশয় স্বার্থপর ব্যক্তিদের কার্যকলাপকে বৃহত্তর পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হইবার সুযোগ দিয়াছে। যে 'ঘোঁট' পূর্বে সঙ্কীর্ণ সমাজে নিবদ্ধ থাকিত তাহা এখন নানাবিধ আন্দোলনের জয়ঢাক বাজাইয়া পৃথিবীর শান্তিকে বিঘ্নিত করিতেছে। আমরা কেহই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। স্থির থাকিবার উপায়ও নাই। প্রত্যহ খবরের কাগজের উত্তেজক হেড লাইন, দৈনিক তিনচারবার সিনেমায় চিত্তচাঞ্চল্যকর নৃত্যগীতের এলাহি আয়োজন, রেডিওর শূন্যপথে আক্রমণ, আমাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

যে শিক্ষা আমাদের স্বস্থ করিতে পারিত সে শিক্ষাও আর নাই। শিক্ষক এখন আর শিক্ষক নন, তিনি বেতনভোগী মজুর মাত্র। সাহিত্যও আজকাল ব্যবসায়ের পণ্য।

যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাঁহাদের সহিত রসিক-সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আর নাই। যখন ছাপাখানা ছিল না তখন গ্রন্থকর্তা নিজের পুস্তক স্বহস্তে সযত্নে লিখিয়া রসিক পণ্ডিতসমাজকে পড়িয়া শুনাইতেন। পুস্তক ভাল হইলে লোকে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত, টুকিয়া রাখিত, পূজা করিত। ছাপাখানার কল্যাণে আজকাল ভাল বই, খারাপ বই একই বেশে সজ্জিত হইয়া বাজারে বাহির হয়, তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকও সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করে এবং বিজ্ঞাপনের কৌশলে প্রথম শ্রেণীর পুস্তকের পাশে সম-গৌরবে স্থান পায়। সমাজেও দেখি আজকাল গণিকা ও সতীসাধ্বী একই বেশে পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছেন। যন্ত্রসভ্যতার সাম্যবাদ মুড়ি-মিছরিকে একাসনে বসাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম—ছাপাখানা হওয়াতে এ যুগের সাহিত্যিকদের আর একটা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পূর্বে কবির সহিত রসিকদের সরাসরি যোগ ছিল। কবি নিজের লেখা রসিককে পড়িয়া শুনাইতেন, তাহা লইয়া রসিকের সহিত

সামনাসামনি আলোচনা করিতেন, লেখা ভাল কি মন্দ, কোথায় সুর জমিয়াছে, কোথায় বেসুরা বাজিয়াছে, সহৃদয় আলোচনার দ্বারা তাহা স্পষ্ট হইত। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে এক মহা আপদ জুটিয়াছে, সমালোচক বলিয়া একদল স্বয়ম্ভু পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বেরসিক, কিন্তু ইঁহারা রসের ক্ষেত্রেই মুরুব্বিয়ানা করিয়া বেড়ান। কাহার লেখা সংবেদনপূর্ণ, কাহার লেখায় দরদ আছে, কাহার লেখায় প্রগতির পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, কোন লেখক প্রতিক্রিয়াশীল, সাহিত্য-রাজ্যে কে সম্রাট, কে মন্ত্রী, কে উজির, কে গোমস্তা, এই সব লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামান এবং বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন। শুনিয়াছি ইঁহাদের সুনজরে পড়িবার জন্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থব্যবসায়ীদের নাকি বহুবিধ কসরৎ করিতে হয়, পুস্তক ভেট দিতে হয়, খোশামোদ করিতে হয়, আরও অনেক কিছু করিতে হয়, তবে নাকি তাঁহারা সদয় হইয়া তাঁহাদের রচনার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, এইসব একদেশদর্শী আত্মম্ভরিতাপূর্ণ রচনা সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার সুযোগ পাইত না। প্রকৃত রসিকরাই তখন কাব্য-সাহিত্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। এখন সে ভার পড়িয়াছে কতক-গুলি মতলববাজ ব্যবসায়ীর উপর। সুতরাং এই ধরনের প্রবন্ধ ছাপা হয়, রেডিওতে নিনাদিত হয়। ফলে বহুলোক সৎসাহিত্যের সন্ধান হইতে বঞ্চিত হন।

সাহিত্যিকের তৃতীয় বিপদ প্রকাশক। প্রকাশক মুখ্যতঃ ব্যবসায়ী। যে বই বেশি বিক্রয় হয় তিনি সেই বই-ই ছাপিতে চান। উত্তেজক যৌন-কাহিনী, গরম গরম পলিটিকাল প্রপাগ্যাণ্ডা, ডিটেক্‌টিভ কাহিনী, সরস গালগল্প প্রভৃতিরই চাহিদা বেশি ; ভাল প্রবন্ধ, কবিতা বা ছোটগল্পের বই বাজারে চলে না শুনিয়াছি। অভিনীত না হইলে নাটকও চলে না। যাঁহারা নাটক অভিনয় করেন বা করান তাঁহারাও ব্যবসাদার এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধু। কোন ভদ্র

নাট্যকারের পক্ষে তাঁহাদের ব্যবহার বরদাস্ত করা কঠিন। সুতরাং যাঁহাদের নাটক লিখিবার প্রতিভা আছে তাঁহারা নাটক লিখিতেই চান না। সাহিত্য-সাধককে বাধ্য হইয়া তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হয়, এমন বই লিখিতে হয় যাহা প্রকাশক-গ্রাহ্য। বলা বাহুল্য, সে সব পুস্তক সব সময় সুসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। ইহাতে প্রকৃত সাহিত্যসাধকের ক্ষোভ হয়, রসিক-সমাজও ক্ষুণ্ণ হন। সাহিত্য সমাজের যে কল্যাণ সাধন করিতে পারিত তাহা পারে না।

যন্ত্র-সভ্যতার আরও দুইটি 'অবদান' বর্তমান সভ্যসমাজের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে—সিনেমা ও রেডিও। সুপ্রযুক্ত হইলে হয়তো ইহারা মানব-সভ্যতার কল্যাণ-সাধন করিতে পারিত, কিন্তু বর্তমান যুগে তাহা হইবার উপায় নাই। কারণ প্রত্যেক যন্ত্রের পিছনে যে যন্ত্রপতিরা বর্তমান, মানবজাতির কল্যাণ-সাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিজেদের স্বার্থসাধন। অধিকাংশ মানবকে শোষণ করিয়া তাঁহারা নিজেরা শক্তিমান হইতে চান। পূর্বে খাইবার পাস দিয়া বহিঃশত্রুরা আসিয়া এ দেশ জয় করিয়াছিল, এখন তাহারা আসিতেছে যন্ত্রের ভিতর দিয়া। মানুষ পশুকেই জয় করিতে পারে, মানুষকে পারে না। এই সব যন্ত্র তাই অধিকাংশ মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামাইয়া দিতে চায়। পূর্বে পাশ্চাত্ত্য বণিকরা চীনাদের অকর্মণ্য করিবার জন্য জোর করিয়া তাহাদের আফিঙের নেশা ধরাইয়াছিল, আমাদের দেশের চাষীকে দরিদ্র করিয়া ধানের ক্ষেতে নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, কারণ নেশাগ্রস্ত বা দরিদ্র জাতিকে শোষণ করা বা শাসন করা সহজ। শোষণ এবং শাসন করিবার জন্য এখন তাহারা নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে—যন্ত্রের পন্থা। আর্ট পরিবেশনের ছলে সিনেমা এবং রেডিওর মারফৎ তাহারা যাহা পরিবেশন করিতেছে তাহা সেই আর্ট নয় যাহা আমাদের সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান দেয়, তাহা সেই আর্ট যাহা আমাদের কামনাকে মোহিনীবেশে সাজাইয়া আমাদের সর্বনাশ করে। পূর্বে দুইচারি জন

—২

ধনী কামুক বাইজী-বিলাসের সুযোগ পাইতেন। যন্ত্রের কল্যাণে সকলেই এখন সে সুযোগ পাইয়াছেন। আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা সকলেই ক্রমশঃ অক্ষম কামুক পশু হইয়া যাইতেছি। শাসক ও শোষকদের সুবিধা বাড়িতেছে।

এই সব যন্ত্র আমাদের আর একটি মূল্যবান সম্পদ হইতেও বঞ্চিত করিতেছে। মহৎকে সুন্দরকে শ্রেষ্ঠকে গুণীকে শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা সভ্য মানবচরিত্রের একটি প্রধান সম্পদ। যন্ত্রযুগের পূর্বে মহৎ সুন্দর শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ করা সহজ ছিল না। তাঁহাদের সম্বন্ধে তাই সাধারণ লোকের ঔৎসুক্য ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। প্রকৃত জিজ্ঞাসুরা, অকপট ভক্তেরা তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। যন্ত্র এখন সমস্তই সুলভ করিয়া দিয়াছে। তাই দেখি রেডিওতে যখন কোন গুণী সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন বা কোনও বিখ্যাত পণ্ডিত সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়িতেছেন, তখন আমরা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সে সব শুনি না, রেডিওটা খুলিয়া দিয়া অসঙ্কোচে হাসি-গল্প-তামাসায় মাতিয়া উঠি। যদি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া, বহু সাধনা করিয়া উক্ত গুণীদের সমীপবর্তী হইতে হইত তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মুখে আমরা এতটা বেসামাল হইতাম না। ইহাতে উক্ত মনীষীদের বিশেষ ক্ষতি হয় না, হয় আমাদের। সব কিছুকেই যন্ত্রের সহায়তায় অতি সহজে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া আমরা কিছুই ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, আমরা বুঝিতেও পারিতেছি না যে পাইলেই গ্রহণ করা যায় না, গ্রহণ করিবার জন্য সাধনা দরকার। পল্লবগ্রাহিসুলভ একটা মিথ্যা অহঙ্কারের মুখোশ পরিয়া আমরা সবজান্তা সাজিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে, আমাদের নির্জ্জন মনে কিন্তু আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানি এবং তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের অশান্ত করিয়া তোলে।

যন্ত্র-সভ্যতার অর্থনৈতিক দিকটা তো আরও ভয়ঙ্কর। পল্লীসমাজ

ভাঙিয়া গিয়াছে, ভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা শহরে আসিয়াছি, কুটিরশিল্প অবলুপ্ত, পেশা এখন আর বংশগত নাই, ব্রাহ্মণ জুতার দোকান খুলিয়াছে, মুচি অধ্যাপনা করিবার চেষ্টায় পরীক্ষা পাশ করিতেছে, ময়রার ছেলে ডাক্তার হইতে চায়, বৈদ্যের পুত্র এন্‌জিনিয়ার হইয়াছে, তবু কিন্তু কাহারও অন্ন জুটিতেছে না, ঘরে বাহিরে দোকানে ফ্যাক্‌টরিতে সর্বত্রই অশান্তি। সকলেই আমরা ছটফট করিতেছি—পূর্বযুগে দাসচালকদের চাবুকের আঘাতে ক্রীতদাসরা যেমন ছটফট করিত, নূতন যুগের অভিনব ক্রীতদাস আমরা ঠিক তেমনি ভাবেই ছটফট করিতেছি—অনেকে হয়তো বুঝিতে পারিতেছি না এক অদৃশ্য Simon hegvee আমাদের চাবকাইতেছে। পূর্বে ক্রীতদাসরা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত, কোনও কোনও সহৃদয় প্রভু ক্রীতদাসকে স্বাধীনও করিয়া দিতেন, এখন কিন্তু দাসত্বের যে নাগপাশে আমরা আবদ্ধ তাহা হইতে মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। তাই অশান্তি আরও বাড়িয়াছে। কোন রকম 'ইজ্‌মে'ই আর মন প্রবোধ মানিতেছে না। সমাজ রাষ্ট্র সমস্তই যেন কারাগাররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রতিবেশীকে মনে হইতেছে শত্রু, ধার্মিককে মনে হইতেছে ভণ্ড, পণ্ডিতকে মনে হইতেছে বেকুব, ধনীকে মনে হইতেছে শোষক। কোথাও শান্তি নাই।

আধুনিক অশান্তির চেহারাটা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বিবৃত করিলাম। পরবর্তী প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিব আমাদের শিক্ষার দ্বারা এ অশান্তি নিবারণ সম্ভব কি না। নূতন কিছু বলিবার স্পর্ধা করি না। নূতন বলিয়া কিছু আছে কি? আমরা পুরাতনকেই বারংবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করি। বেদান্তকে সাংখ্যকে থিওরি অব রিলেটিভিটির আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া চমকিত হই। অতি আধুনিক আণবিক বোমার স্বরূপ যে বেদব্যাসের কল্পনাতে অন্ততঃ ছিল তাহার প্রমাণ পাই ব্রহ্মশির বা পাশুপত অস্ত্রের বর্ণনায়।

অশান্তি মানবসমাজের অতি পুরাতন ব্যাধি। অতীতকালে

যাঁহারা চিন্তানায়ক ছিলেন তাঁহারাও এ ব্যাধির প্রতিকার-চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রয়াস যে নিষ্ফল হয় নাই তাহার প্রমাণ অতীতের গৌরবময় ইতিহাস। আধুনিক যুগে আমাদের শিক্ষার বহুবিধ সংস্কারের কথা শুনি—উড সাহেবের ডেস্‌প্যাচ, গোখলের বিল, স্যাড্‌লার কমিশন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার, স্বাধীন ভারতেও শিক্ষার নানাবিধ সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে, কিন্তু আমার মনে হয় আসল ব্যাপারটার উপর যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। খাদ্যদ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হয়—প্রাচীন বলিয়া এ সত্য আমরা বর্জন করি নাই। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অশান্তি নিবারণেরও একটা প্রতিকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরবর্তী প্রবন্ধে তাহার স্বরূপ বিচার করিবার প্রয়াস পাইব।

(দুই)

আমরা এখন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। শুনিয়াছি আমাদের জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করাই বর্তমান রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ভারতবর্ষ জ্ঞানে গরিমায় যখন সত্যই বড় ছিল, যখন সে সত্যই স্বাধীন ছিল, তখন তাহার শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ ছিল তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়াই আলোচনা আরম্ভ করি। তিনি বলিতেছেন—"কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞান-শিক্ষা, সাহিত্য-শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা বা টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃতা হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং কোন্ শিক্ষা ভাল, কোন্ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা

মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া ওঠে তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না," অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে মানুষ নামক ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব যে উপায়ে সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয় তাহার নামই শিক্ষা। পূর্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি আজকাল সমাজ বলিয়া কিছু নাই। আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীতে স্বাধীনতার আস্ফালন করি বটে, কিন্তু আসলে আমরা সকলেই দাস। যন্ত্রপতিরাই পৃথিবীর মানব-সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহারাই আমাদের প্রভু, ভর্তা এবং শাসনকর্তা। আমাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের দিকে তাঁহাদের উৎসাহ নাই, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ যাহাতে না হয়, সকলেই যাহাতে বিরাট যন্ত্রের নাট্‌ বা বল্টুতে পরিণত হয়, সেই দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য। আমেরিকার বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার Alexis Carrel তাঁহার *Man, the Unknown* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিতেছেন—Modern Society ignores the individual. It only takes account of the human beings. It believes in the reality of the universals and treats men as abstractions. The confusion of the concepts of individual and of human being has led industrial civilisation to a fundamental error, the standardisation of men. If we were all identical, we could be reared and made to live and work in great herds like cattle. But each one has his own personality. He cannot be treated like a symbol. Children should not be placed, at a very early age in schools where they are educated wholesale.

As is well-known, most great men have been

brought up in comparative solitude or have refused to enter the mould of the school....Education should be the object of unfailing guidance. Such guidance belongs to parents. They alone, and more especially the mother, have observed since their origin, the physiological and mental peculiarities whose orientation is the aim of education. Modern society has committed a serious mistake by entirely substituting the school for familial training. The mothers abandon their children to the kindergarten in order to attend to their careers, their social ambitions, their sexual pleasures, their literary or artistic fancies or simply to play bridge, go to the cinema and waste their time in busy idleness. They are thus responsible for the disappearance of the familial group where the child was kept in contact with adults and learned a great deal from them. He learns little from the children of his own age....The neglect of individuality by our social institutions is likewise responsible for the atrophy of the adult........In the immensity of modern cities he is isolated and as if lost. He is an economic abstraction, a unit of the herd. He gives up his individuality. He has neither responsibility nor dignity. Above the multitude stand out rich men, the powerful politicians, the bandits. The others are only nameless grains of dust........"

এই প্রবন্ধটি একটু বেশি করিয়াই উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ ইহাতে আধুনিক শিক্ষার যে সব গলদ এবং তাহার জন্য ব্যক্তিত্ব-বিলোপের যে চিত্র ডাক্তার ক্যারেল অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং যাহা এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে ; পুরাকালে আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি

প্রচলিত ছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই সব গলদ এড়াইয়া চলা।

সে শিক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটি আলোচনা করিবার পূর্বে তখনকার সামাজিক গঠন জানা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন যে সে যুগের বিজয়ী আর্যগণ যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা নিজেদের জন্য, বিজিত অনার্যদের জন্য নহে। অনার্যদের প্রথম প্রথম তাঁহারা অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। নিজেদের সুবিধার জন্য যোগ্যতা অনুসারে তাঁহারা নিজেদের তিন বর্ণে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ইহার মধ্যে কোনরূপ জোরজবরদস্তি ছিল না। অধ্যাপক Altaker তাঁহার *Education in India* পুস্তকে লিখিয়াছেন—"There is a general impression that Hindu educationists suppressed personality by prescribing a uniform course of education and enforcing it with iron discipline. Such, however, was not the case. The caste system had not become hide-bound down to 500 B, C., and till that time a free choice of profession or career was possible both in theory and practice........"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জীবনের আদর্শ কি হইবে তাহা নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট ছিল। সারা জীবন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিক চর্চা ছিল ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ ছিল শক্তির সাধনা এবং বৈশ্যের আদর্শ ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। প্রত্যেকেই দ্বিজ ছিলেন এবং প্রত্যেককেই উপনয়নের পর গুরুগৃহে জীবনের প্রথম আশ্রম অতিবাহিত করিতে হইত। নিজের নিজের গুণ বা প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য হইতেন। এখন যেমন একই বাড়ির ছেলে কেহ অধ্যাপক, কেহ সৈনিক, এবং কেহ দোকানদার, কেহ বা অন্য কিছু হন ; অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার *Ancient Indian Education* পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

In the sphere of economic life and interests the free choice of occupations or the movement of labour, horizontal or vertical was subordinated to the choice of the ideals and ends of life....Some occupations were approved for certain castes and condemned for others.

এই সব ব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান ছিল না। আর্যসংস্কৃতির মহত্ত্বকে ম্লান করিবার জন্য অনেকে শূদ্রদের প্রতি তাঁহাদের হৃদয়হীন ব্যবহারের উল্লেখ করেন, এ সম্পর্কে 'শোষক', 'শোষিত' ইত্যাদি নানা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আর্যদের শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শ তাঁহাদের উদার সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেজন্য এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

যাঁহাদের তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন তাহারাই ছিল শূদ্র অর্থাৎ দাস। তখন বিজিত দেশের লোকেরা দাস বলিয়াই সাধারণতঃ গণ্য হইত, তখন সর্বদেশে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন আমরা যেমন গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়ার স্বাধীনতা স্বীকার করি না, তখনও মানব-সমাজ তেমনি দাসদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন না। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতায় যে নূতন দাসত্ব-প্রথার প্রচলন হইয়াছে তাহাতেও দাসদিগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। ভারতবর্ষীয় আর্যদের স্বপক্ষে তবু একটা কথা বলিবার আছে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দাসদের উপর যে বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা আমরা পাই, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে তাহা পাই না। পুরাণে কাব্যে রামায়ণ-মহাভারতে মাঝে মাঝে আছে বটে মুনিরা দাসদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, অথবা শুনঃশেফকে যজ্ঞে বলিদান দিবার জন্য কিনিয়া আনা হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডবের অনার্যদলন, খাণ্ডবদাহন, শ্রীরামচন্দ্রের শম্বুকবধ প্রভৃতি ঘটনাকেও যদি দাসনির্যাতনের পর্যায়ে গণ্য করি তবু অন্যান্য দেশের তুলনায়, এমন কি আধুনিক সভ্যযুগেরও দাস-দলনের তুলনায়, সে সব নগণ্য। জালিওয়ানবালাবাগের কথা,

বিয়াল্লিশের অত্যাচারের কথা, এমন কি আজকাল কেনিয়ায় যাহা হইতেছে তাহার কথা স্মরণ করুন।

আর্যগণ এদেশে আসিয়াই মহাপুরুষ বা দার্শনিক হইয়া ওঠেন নাই। তাঁহারাও এদেশে আসিয়াছিলেন বিজেতাসুলভ মনোভাব লইয়া। কিন্তু এদেশে কিছুকাল বাস করিবার পর তাঁহারা যে ধর্ম, যে সভ্যতার পত্তন করেন, যে আদর্শ তাঁহাদের পরবর্তী সমাজ-জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, যে আদর্শ সনাতন ভারতীয় আদর্শ নামে পরিচিত তাহাতে শূদ্রদের প্রতি ঘৃণার আভাসমাত্র নাই। পুরাণে কাব্যে এ রকম নিদর্শন হয়তো দুই-একটা আছে, কিন্তু প্রেমের নিদর্শনও কম নাই। রামায়ণের যুগে শ্রীরামচন্দ্র শম্বুককে, তাড়কাকে, রাবণকে, বালীকে এবং আরও অনেক রাক্ষস-রাক্ষসীকে বধ করিয়াছেন সত্য, লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাকও কাটিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ওই রামায়ণযুগেই আমরা পাই গুহক চণ্ডালকে, শবরীকে, রামভক্ত হনুমানকে। মহাভারতের যুগে তো একেবারে পট-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং মহাভারতকার কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নই পুরাপুরি আর্য নহেন, তিনি লোমশ, কৃষ্ণবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর। পাণ্ডুজননী তাঁহাকে দেখিয়া মূর্ছা গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পিতা ঋষি পরাশর হয়তো আর্য ছিলেন কিন্তু তাঁহার জননী সত্যবতী ধীবরকন্যা। এই সত্যবতী পরে রাজা শান্তনুর ধর্মপত্নীও হইয়াছিলেন। এই মহাভারতেই দেখি ভীম হিড়িম্বাকে, এবং অর্জুন উলূপীকে, চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিতেছেন। রাজা নহুষ রাক্ষস উরগ প্রভৃতিকে পালন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেও দেখি উভয়পক্ষেই অনার্য নৃপতিরা রহিয়াছেন, হীন দাসরূপে নহে, নির্ভরযোগ্য বন্ধুরূপে। গন্ধর্ব, কিন্নর, পন্নগ, দৈত্য, দানব, নাগগণ যদি অনার্য হন তাহা হইলে তাঁহাদের মহিমায় পুরাণ-মহাভারত পরিপূর্ণ। একলব্য, অধিরতসুত, দাসীপুত্র বিদুর, জতুগৃহের নির্মাতা শিল্পী পুরোচন, মায়াবী অঙ্গারপর্ণ প্রভৃতি যে সব চরিত্র মহাভারতকার উজ্জ্বলবর্ণে

অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহারা কেহই হেয়চরিত্র নহেন। মহর্ষি নারদ কুবের-সভার, বরুণ-সভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে অনার্যদেরই আধিক্য দেখিতে পাই। এ কথা অবশ্য ঠিক ভীম বক, কির্মীর প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ, শাল্বকে এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরা বহু অনার্যকে ধ্বংস করিয়াছেন ; কিন্তু ইঁহাদের মহিমা, ইঁহাদের শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না, রাবণের স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনা, কুবেরের অলকাপুরীর বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় না তাঁহারা তাঁহাদের ছোট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাল্ব যে আকাশগামী সৌভপুরীতে চড়িয়া পৃথিবী হইতে প্রায় এক ক্রোশ উর্ধ্বে থাকিয়া শরসন্ধান করিতে পারিতেন একথা বেশ সাড়ম্বরেই বর্ণিত হইয়াছে।

মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় যে অনার্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াই হয়তো অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্মের কল্পনা আর্য ঋষিদের চিত্তে প্রথমে প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই অনার্যগণ সর্বভূতে—এমন কি সর্পে, ব্যাঘ্রে, সর্বপ্রকার হিংস্র অহিংস্র জীবজন্তুতে, বৃক্ষে, প্রস্তরখণ্ডে, আলোকে অন্ধকারে, সর্বত্র দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন, দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই হয়তো পরবর্তী যুগে আমরা মূর্তিপূজক হইয়াছি, দেবদেবীদের সহিত সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, বৃষ, হংস, পেচক প্রভৃতিরও পূজা করিতেছি।

এই সব হইতে মনে হয় কালক্রমে আর্যদের সহিত অনার্যদের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রীতির সম্পর্ক সত্ত্বেও শূদ্রদের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। তাহারও কারণ ঘৃণা নয়, সাবধানতা। আর্য ঋষিদের বিশ্বাস ছিল বেদমন্ত্রের উচ্চারণ যদি নির্দোষ না হয় বিশ্বের অমঙ্গল হইবে। যেহেতু শূদ্রদের মাতৃভাষা বৈদিক ভাষা নয় সেইহেতু তাঁহাদের ভয় ছিল শূদ্রেরা বৈদিক মন্ত্র ভুল উচ্চারণ করিবে এবং তাহা হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবে।

বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে তাঁহারা খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। প্রথমে আর্য রমণীগণের বেদপাঠে অধিকার ছিল্। গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা, বিশ্ববারা প্রভৃতি অনেকেই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। কিন্তু এ-দেশে বহুকাল বাসের পর আর্য রমণীগণের আর্যত্ব যখন কমিতে লাগিল, আর্যগণও যখন অনার্য রমণী বিবাহ করিতে লাগিলেন তখন ঋষিরা রমণীদের এবং পতিত আর্যদেরও বেদ-পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। বেদ তখন তাঁহাদের সভ্যতা শক্তি ও সংহতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল, বেদের পবিত্রতা রক্ষা করা সে যুগে সমস্ত জাতির আত্মরক্ষারই নামান্তর ছিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে এখন যে কারণে মৃত্যুদণ্ড হয়, বেদের পবিত্রতা নষ্ট করিলেও সে যুগে ঠিক সেই কারণেই মৃত্যুদণ্ড হইত। ইহাই তখন নিয়ম ছিল, এ নিয়ম পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা রাজারও ছিল না। এই জন্যই শ্রীরামচন্দ্র শম্বুককে বধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অনার্যদের সম্পর্কে আসিয়া কিছুদিন পরে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ পরে দেখিতে পাই অনার্য রাজারাও যজ্ঞ করিতেছেন। অনার্য দানব রাজা বৃষপর্বা কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাক সন্নিধানে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই যজ্ঞেরই দ্রব্যাদি লইয়া অনার্য ময়দানব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে চমকপ্রদ সভা নির্মাণও করিতেছেন, এমন কি অর্জুনের দেবদত্ত নামক শঙ্খটিও বৃষপর্বার যজ্ঞস্থল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পরে দেখি, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ একজন শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত বলিয়া কীর্তিত, নাগরাজ বাসুকি একজন প্রথম শ্রেণীর তপস্বী বলিয়া সম্মানিত, পুরাণকার তাঁহার মস্তকে সমস্ত পৃথিবীর ভার অর্পণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। পরে দেখি সমস্ত বলশালী অনার্যগণ আর্য সভ্যতার দীপ্তিতে দীপ্যমান, পুরাণের প্রায় সমস্ত প্রতাপশালী দৈত্যদানবেরা তপস্বী, মহর্ষি উশনা দৈত্যদের গুরু-পদে আসীন হইয়া শুক্রাচার্য নামে খ্যাত। আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে দেখি আর্যরা শূদ্রদের ছোঁওয়া

অন্নজল গ্রহণ করিতেছেন না। ইহারও কারণ সম্ভবতঃ ঘৃণা নয়, সাবধানতা। শূদ্ররা পরাজিত, শূদ্ররা অপরিচিত, তাহাদের সামাজিক আচার-আচরণও অদ্ভুত, তাহাদের প্রদত্ত অন্নজল গ্রহণ করা তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্যই সমীচীন মনে করিতেন না। প্রথম প্রথম অপরিচিত অনার্য পরিবেশে তাঁহাদের অত্যন্ত সাবধানে চলা-ফেরা করিতে হইত। এমন কি মহাভারতের যুগেও দেখি পাণ্ডবজননী কুন্তী পুত্রদের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন, ভাবিতেছেন কোনও মায়াবী নিশাচর তাহাদের কোনও অনিষ্ট করিল না তো। বলা বাহুল্য মায়াবী নিশাচর মানে অনার্য।

প্রথম প্রথম কিছুদিন তাঁহারা অনার্যদের বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাই সম্ভবতঃ তাহাদের প্রদত্ত অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। আধুনিক কালেও তো দেখি ট্রেনে নোটিশ দেওয়া রহিয়াছে—"অপরিচিত লোকের নিকট হইতে খাদ্য, পানীয়, এমন কি বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত গ্রহণ করিবেন না।" আধুনিক সামরিক আইনও এসব বিষয়ে বিশেষ সতর্ক। এই সতর্কতা কি ঘৃণা?

বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে ঈষৎ অবান্তর হইলেও আর্যদের সহিত শূদ্রদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম। তাহার কারণ অনেকে মনে করেন আর্যরা শূদ্রদের ঘৃণা করিতেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য কিন্তু অন্যরূপ। প্রথম প্রথম বিজেতাসুলভ মনোভাব হয়তো তাঁহাদের ছিল, কিন্তু কিছুকাল এদেশে বাস করিবার পর যে ধর্ম, যে সংস্কৃতির পত্তন তাঁহারা করিয়াছিলেন, যে শিক্ষার আদর্শ তাঁহাদের চিত্তকে ও সমাজকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল তাহাতে ঘৃণার স্থান নাই জোরজবরদস্তি বা ঘৃণার শাসন স্বল্পায়ু। ন্যায়ের শাসন, প্রেমের শাসন, উদারতার শাসন দীর্ঘজীবী। যে ধর্মের ভিত্তিতে আর্যগণ এদেশে সভ্যতার পত্তন করিয়াছিলেন তাহা চারি হাজার বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও এখনও সগৌরবে টিঁকিয়া আছে। অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার *The Hindu View of Life* পুস্তকে

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক মিস্টার ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের যে অভিমত *Oxford History of India* হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই—India, beyond all doubt, possesses a deep fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or political superiority. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sect. এই unity, বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই একত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল কারণ তাঁহাদের শিক্ষার মূলমন্ত্রই ছিল একত্বের সন্ধান। ঘৃণার স্পর্শে এই সন্ধান ব্যাহত হইত।

বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রত্যেক আর্যসন্তানের জীবন চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচর্য আশ্রম, আর্যজীবনের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে আর্যজীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইত। ব্রহ্মচর্যাশ্রম উত্তীর্ণ না হইলে কোন আর্যসন্তানই পরবর্তী গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি পাইতেন না। কোনও ভদ্র গৃহস্থ তাঁহাকে কন্যাসম্প্রদানই করিতেন না। ভিত্তি মজবুত না করিয়া তাহার উপর হর্ম্য-নির্মাণের পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না। সত্য ও ধর্মই সে ভিত্তির প্রধান উপকরণ। সত্যের সন্ধান এবং সে সন্ধানের উপযোগী চরিত্র-নির্মাণই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য ছিল। একথা তাঁহারা বলিতেন না যে 'লেখাপড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই'—কোনও মিথ্যা আশ্বাস বা অলীক মোহের উপর সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্তমান যুগের দার্শনিক পণ্ডিত-গণও আজকাল বলিতেছেন যে শিশুর মনে শিক্ষার ছলে এমন কোনও জিনিস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত নয় যাহা মিথ্যা, যাহা জীবনের নিকষে যাচাই করিলে মূল্যহীন প্রতিপন্ন হইবে। Alfred North Whitehead তাঁহার *The Aims of Education* প্রবন্ধে এই কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে বলিয়াছেন। সে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল তাহা ব্রহ্মচর্য এই নামের মধ্যেই স্পষ্ট। ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া

ব্রহ্মকে জীবনে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের চরম পরিণতি, সেই পরিণতি লাভ করিবার জন্য যে প্রস্তুতি—তাহাই শিক্ষা। কারণ ব্রহ্মই সত্য, পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্র্য সেই একই সত্যের বিচিত্র প্রকাশ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথিবীর যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা তাহার সত্য রূপ নয়, তাহা মায়াময় রূপ, তাহা মিথ্যা, তাহা ক্ষণস্থায়ী। বহুরূপী বিচিত্র মায়াযবনিকার অন্তরালে যে সত্য, যে ধ্রুব, যে অনাদি অনন্ত অখণ্ড শক্তি বিরাজমান তাহার নাম ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, God, Primordial Energy, যাহাই দিন, তাহাকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। ব্রহ্মকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুসারে উপলব্ধি করিতে হয়—এই উপলব্ধির কোন বাঁধাধরা একটা পথ নাই, প্রত্যেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুসারে নিজের পথ নিজেই আবিষ্কার করেন, গুরু তাঁহার সহায়ক মাত্র। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই—মুক্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্য মুক্তি-লাভ, চাকরি-লাভ নয়, ডিগ্রি-লাভ নয়, কোন প্রকার ঐহিক সুখ নয়। ঐহিক সুখদুঃখ, ঐহিক জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য পরিণাম একথা তাঁহারা জানিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা বলেন নাই—Eat, drink and be merry, to-morrow you die. কারণ ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এই দেহটাই মরণশীল, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা অনুভব করি তাহাই নশ্বর—আত্মা কিন্তু অমর। এই আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মানুসন্ধানই মানবজীবনের একমাত্র শ্রেয়ঃ, আত্মানং বিদ্ধি তাই আর্য-শিক্ষার প্রধান উপদেশ। Eat, drink করিয়া merry হইতে তাঁহারা মানা করেন নাই, জীবনকে উপভোগ করায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল, রাজসিক জীবনের বিবিধ বিলাসকে কেন্দ্র করিয়া বহু প্রকার শাস্ত্র ও গ্রন্থ তাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের জীবন যে বহুবিধ ক্ষুধায় কাতর এ জ্ঞান তাঁহাদের ছিল। কিন্তু তাঁহারা এইসব ক্ষুধাকে সামাজিক কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই ক্ষুধা-প্রসঙ্গে যে উপদেশ

তাঁহারা দিয়াছেন তাহাই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মূলমন্ত্র। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—জীবনকে ভোগ কর ক্ষতি নাই, কিন্তু আসক্ত হইও না। আসক্তি মানেই বন্ধন এবং বন্ধনের পরিণামই দুঃখ। যে অনন্ত পথের তুমি যাত্রী সে পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে যদি আসক্তির শৃঙ্খল প্রতি পদক্ষেপে তোমার গতি রোধ করে? সুতরাং আসক্তি ত্যাগ কর, যেকোনও প্রকার আসক্তিই, এমন কি ব্রহ্মের প্রতি আসক্তিও দুঃখদায়ক। ভোগ কর, কিন্তু ভোগাসক্ত হইও না। আসক্তি তোমার মুক্তি-লাভের বাধা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলিতেছেন—The Hindu Code of practice links up the realm of desires with the perspective of the Eternal. It links together the kingdoms of Heaven and Earth.

এই perspective of the Eternal, ভূমার পটভূমিকায় জীবনকে দর্শন, আর্যসভ্যতার মূল সুর। আর্য ঋষি বলিতেছেন—দেহের অবসান ঘটিবে, তোমার বিত্ত, তোমার প্রতাপ, তোমার ঐশ্বর্য, তোমার অলঙ্কার অহঙ্কার সমস্তই লুপ্ত হইবে, কিন্তু তুমি লুপ্ত হইবে না, তুমি অমর, তুমি অনন্ত পথের যাত্রী, তোমার পার্থিব জীবন তোমার অনন্ত যাত্রাপথের অংশ মাত্র, এই অংশটুকুর সম্বন্ধে মোহ-পোষণ করিও না, আত্মবিস্মৃত হইও না, হইলেই কষ্ট পাইবে।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥
কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবং কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥
নলিনীদলগতজলমতি তরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥

শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর আর্যশিক্ষার সারমর্ম। জীবন-সম্বন্ধে সত্যদর্শন এবং দুঃখ-নিবারণের প্রকৃত উপায় যে শিক্ষার লক্ষ্য সেই

শিক্ষাই তাঁহারা জীবনের প্রথম আশ্রমে আর্যসন্তানগণকে দিতেন। অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন—Of all the peoples of the world the Hindu is the most impressed and affected by Death as the central fact of Life. He cannot get away from the fact that while man proposes God disposes. Therefore he feels he cannot take life seriously and scheme for it without a knowledge of the whole scheme of creation.

যাঁহারা মানবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদেরও অনেকের অভিমত মৃত্যুই সম্ভবতঃ আমাদের প্রথম ধর্ম-শিক্ষক। মৃত্যুই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়—ইহাই কি শেষ? উপনিষদের ঋষি সত্যসন্ধানের নিমিত্ত তাই নচিকেতাকে যমের নিকটে লইয়া গিয়াছেন।

নচিকেতা যমকেই প্রশ্ন করিতেছেন—

মৃত্যুর পরে আছে সংশয় সদাই,
কেহ বলে থাকে কিছু, কেহ বলে নাই;
হে যম, তৃতীয় বরে, আজিকে তোমার কাছে
সত্যকথা শুনিবারে চাই।

যম তাহাকে এই সত্যকথা, সনাতন গূঢ় ব্রহ্মকথা পরে বলিয়াছিলেন, প্রথমে কিছুই বলেন নাই। নচিকেতা সত্য-লাভের প্রকৃত অধিকারী কি না তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহাকে প্রলুব্ধ করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—

শতজীবী পুত্র পৌত্র করহ প্রার্থনা,
পশু হস্তী অশ্ব স্বর্ণ দিব চাও যত,
বিশাল রাজত্ব লও,
নিজ আয়ু চাহ ইচ্ছামত,
এর তুল্য অন্য বর যথা ইচ্ছা, নচিকেতা, করহ প্রার্থনা,
লও বিত্ত, অমরত্ব, রাজা হও বিশাল রাজ্যের—
পূর্ণ কর সকল কামনা;

মর্ত্যলোকে তুর্লভ যা সেই সব কাম্য বস্তু
যাহা ইচ্ছা মাগ মোর কাছে,
ওই যে রথের পরে বাদ্যযন্ত্র-সহ রমণীরা আছে
মনুষ্যের আয়ত্তের অতীত ইহারা—
মোর বরে ভোগ কর ইহাদেরও পরিচর্যা-সুখ,
মৃত্যু-বিষয়েতে শুধু, নচিকেতা, হ'য়ো না উৎসুক।

নচিকেতা কিন্তু ভুলিবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন—
অনিশ্চিত মৃত্যুশীল এই সব ভোগ্য বস্তু
জীর্ণ করে ইন্দ্রিয়ের শক্তি আর সুখ,
জীবনই তো ক্ষণস্থায়ী ; বাহন বা নৃত্য-গীত
চাহি না কো, তোমারই থাকুক।

তখন যম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সত্যের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। প্রথমেই বলিলেন—
নচিকেতা, তুমি প্রিয়, প্রিয়রূপী কামনা সকল
ত্যজিয়াছ বিচার করিয়া,
যে বিষয়াকীর্ণ মার্গে বহুলোক হ'ল নিমজ্জিত
তুমি তাহা থাকনি ধরিয়া ;
অবিদ্যা ও বিদ্যা এরা অতি ভিন্নমুখী
বহমান বিপরীত ধারে,
নচিকেতা, তুমি জানি বিদ্যা-অভিলাষী,
প্রলুব্ধ করেনি শত কামনা তোমারে।
অবিদ্যা অন্তর-মাঝে সদা বর্তমান
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে নিজেদের ভাবে জ্ঞানবান
অন্ধ-নীত অন্ধসম মূঢ় জেনো তারা
ভ্রান্ত পথে সদা ভ্রাম্যমান।

কামনা, বিষয়, অবিদ্যা ও অহঙ্কার ইহারা সত্য-জ্ঞানের, ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিপন্থী। 'ব্রহ্ম' কথাটা শুনিবামাত্র অনেকে চমকাইয়া ওঠেন, মনে মনে বলেন—ও বাবা। অনেকের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া ওঠে, ভাবেন এইবার ভণ্ডামির পালা শুরু হইল। ইহার কারণ ব্রহ্মকে লইয়া সত্যই অনেক ভণ্ড যুগে যুগে বহুলোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে, এখনও করিতেছে। ব্রহ্ম শব্দটাকেই তাহারা অশুচি অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। ব্রহ্ম না বলিয়া যদি বলি Truth তাহা হইলে অনেকে হয়তো সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবেন। কারণ আমরা সকলেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে Truth-এর সন্ধানই করিতেছি। এই Truth--এই সত্যই ব্রহ্ম। আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বস্তুতঃ মানব-মনীষার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার একটিমাত্রই উদ্দেশ্য—Truth, সত্য, ব্রহ্ম। মুনি ঋষি সত্যদ্রষ্টারা যে কেবল পুরাকালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নয়, একালেও তাঁহারা আছেন। একালের সত্যদ্রষ্টাদের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন তাঁহাদের দর্শনের সহিত সেকালের মুনি ঋষিদের দর্শনের বিশেষ কোন তফাত নাই। যম নচিকেতার নিকট ব্রহ্মের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি।

আকাশেতে হংস তিনি, অন্তরীক্ষে বসু তাঁর নাম,
বেদীতে তিনিই হোতা, গৃহে তিনি অতিথি ও দ্বিজ—
মানবে দেবেতে সত্যে আকাশেতে তাঁর অবস্থান,
জলজ ভূমিজ তিনি সত্যজ অদ্রিজ—
মহাসত্য তিনি সুমহান্।

একই অগ্নি ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন।

একই বায়ু ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন।
সর্বলোক-চক্ষু-সূর্য অশুচিদর্শনে যথা
না হ'ন মলিন
সর্বভূতস্থিত আত্মা নির্লিপ্ত তেমনি
জাগতিক দুঃখমাঝে স্বতন্ত্র অ-লীন।

বাসনাকামনা-রহিত হইয়া এই ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়াই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য—ব্রহ্মবিদ্যাই বিদ্যা। কারণ আর্যঋষিগণের মতে সুখশান্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায় ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভ করা। ওই যমই নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

সর্বভূত অন্তরাত্মা, এক যিনি, নিয়ন্তা সবার
আপনার একরূপে করেন বহুধা,
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়—তাঁরা পান নিত্য-সুখ-সুধা।
অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের চৈতন্য-স্বরূপ,
সকলের মধ্যে এক কাম্য যিনি করেন বিধান
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয় তাঁহারাই চির-শান্তি পান।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই আমরা আমাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই নিখিল বিশ্বের সহিত আমাদের সম্পর্ক কি জানিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদের সাহায্য করে। এই ব্রহ্মজ্ঞান পুস্তক পড়িয়া অথবা বক্তৃতা শুনিয়া লাভ করা যায় না। ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনা করিতে হইবে। স্বামী

বিবেকানন্দের ভাষায়—Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within, by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these and be free. This is the whole of religion. Doctrine or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details.

এই ধর্ম-অভিমুখে চিত্তকে উন্মুখ করিয়া তাহার জন্য ব্রহ্মচারীকে প্রস্তুত করাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের লক্ষ্য।

এখন দেখা যাক এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষই ছিল এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, সেইজন্য গুরুর সহিত শিষ্যের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম এবং প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিষ্যই গুরুকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবে এবং গুরু যদি শিষ্যকে উপযুক্ত অধিকারী বিবেচনা করেন তবেই তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। এই অধিকার-বিচার সে যুগে একটা মস্ত ব্যাপার ছিল। এখন যেমন টাকা দিয়া যে কোনও ছাত্র যে কোনও স্কুলে ভরতি হইতে পারে তখন সে উপায় ছিল না। গুরু শিষ্যকে নির্বাচন করিয়া লইতেন। সে নির্বাচনের মানদণ্ড থাকিত তাঁহার মনে, তাঁহার নিজস্ব বিচারে, বাহিরের কোনও নিয়ম দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হইতেন না। গুরু অসাধু হইলে এরূপ নিয়মে অনেক শিষ্যের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সে যুগে গুরুরা প্রায়ই অসাধু হইতেন না; যে যে কারণে লোকে সাধারণতঃ অসাধু হয় সে সব কারণ তাঁহাদের জীবনে আসিবারই সুযোগ পাইত না, তা ছাড়া বিদ্যাদান সেকালে অর্থকরী ব্যবসায় ছিল না। যদিও মনুতে, ছান্দোগ্য উপনিষদে, স্মৃতিচন্দ্রিকাতে লেখা আছে শিষ্যের ধনদানের ক্ষমতা তাহার অন্যতম যোগ্যতা* কিন্তু ধনদানটা শিক্ষাব্যাপারে কখনও

*প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি—শ্রীবিমলাচরণ দেব (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫১)

প্রাধান্য পায় নাই। বিদ্যা বিক্রেয় পণ্য নহে ইহাই ছিল আদর্শ। আধুনিক যুগেও যাঁহারা বিশেষ কোন গুণীর নিকট বিশেষ কোন বিদ্যা শিখিতে যান তাঁহাদেরও নির্ভর করিতে হয় গুরুর নির্বাচনের উপর। অর্থ বা ডিগ্রী সেখানে কোনই কাজে লাগে না। শিষ্য সেই বিদ্যালাভের অধিকারী কি না তাহাই তাঁহারা বিচার করেন। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধে একটা উপমা প্রচলিত আছে। গুরুর অন্তর যেন একটি জ্বলন্ত প্রদীপ ; শিষ্য নিজের অন্তর-প্রদীপটিকে গুরুর প্রদীপের শিখা হইতে জ্বালিয়া লইবে। কিন্তু প্রদীপ যতই চাকচিক্যশালী বা বহুমূল্য হোক না কেন, ভিতরে তৈল বা সলিতা না থাকিলে সে প্রদীপ জ্বলে না। প্রদীপে তৈলসলিতা আছে কি না তাহার বিচারই অধিকার-বিচার। বীজ বপন করিবার পূর্বে কৃষক যেমন জমির গুণাগুণ বিচার করে শিষ্যকে গ্রহণ করিবার পূর্বে গুরুও তেমনি শিষ্যের গুণাগুণ বিচার করিতেন। শিষ্য হইবে শ্রদ্ধাবান, সংযতেন্দ্রিয়, শুশ্রূষু ; সে হইবে সাধু, শুচি এবং মেধাবী। মনুতে, ছান্দোগ্যে, গীতায় এবং প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণে শিষ্যের কি কি গুণ হওয়া উচিত তাহা নানা স্থানে নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। বিদ্যার্থীর পাঁচটি লক্ষণ একটি বহুপ্রচলিত শ্লোকে নিবদ্ধ আছে—

কাকচেষ্টঃ বকধ্যানী শ্বাননিদ্রস্তথৈব চ।
অল্পাহারী গৃহত্যাগী বিদ্যার্থী পঞ্চলক্ষণঃ ॥

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব মহাশয় ১৩৫১ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে ‘প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি’ নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুন্দর একটি আলোচনা করিয়াছেন।

সেকালে শিষ্য-মনোনয়নের ব্যাপারে আর একটি জিনিসকে তাঁহারা প্রাধান্য দিতেন—সেটি শিষ্যের বংশ-পরিচয়। এ যুগে এ নিয়ম হয়তো অচল। কিন্তু অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার *Ancient Indian Education* গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের মনীষীরাও এখন এই বংশ-বিচারের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন—

"The investigations of Haggerty, Nash, and Goodenough show further that the educational status and vocation of the parents have a significant correlation with the level of capacity of the children, as indicated by the Intelligence Quotient. For instance, the children of the professional parents or of those of a higher academic standing, possess, on the whole, a higher value of I. Q. The implications of such facts cannot be ignored in the scheme of National Education.

পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতগণ নানারূপ মানদণ্ড ব্যবহার করিয়া সেকালের আচার্যদের মতোই ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে, সকলে সকল রকম বিদ্যার অধিকারী নহেন। ব্রাহ্মণের পুত্রই যে ব্রাহ্মণত্ব লাভে অধিকারী হইবেনই তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না, কিন্তু হইবার সম্ভাবনা যে বেশি তাহাও স্বীকার করা শক্ত। তবে এ কথাও ঠিক যে বর্তমান সমাজের সর্ব স্তরেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্তমান। যাহারা ব্রাহ্মণপ্রকৃতির, যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভের উপযুক্ত তাহাদের বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার নির্দেশও পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা আজকাল দিতেছেন। Dr. Alexis Carrel বলিতেছেন যে, বর্তমান চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অবাঞ্ছিত দুর্বল লোকদের মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া সমাজকে এক শোচনীয় অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে। পূর্বে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যে সব দুর্বল লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সুস্থসবলদের জন্য স্থান করিয়া দিত এখন বিজ্ঞানের জন্য তাহা হইবার উপায় নাই। তিনি বলিতেছেন—Many

inferior individuals have been conserved through the efforts of hygiene and medicine. We cannot prevent the reproduction of the weak when they are neither insane nor criminal, or destroy sickly or defective children as we do the weaklings in a litter of puppies. The only way to obviate the

disastrous predominance of the weak is to develop the strong. Our efforts to render the unfit normal are evidently useless. We should, then, turn our attention toward promoting optimum growth of the fit. By making the strong still stronger, we could effectively help the weak. For the herd always profits by the ideas and inventions of the elite. Instead of levelling organic and mental inequalities we should amplify them and construct greater men. We must single out the children who are endowed with high potentialities and develop them as completely as possible...Such children may be found in all classes of society, although distinguished men appear more frequently in distinguished families than in others......ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ডেমোক্র্যাটিক আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকও অধিকারী-বিচারের পক্ষপাতী। প্রত্যেক কলেজে ভরতি হইবার সময় এখনও ছাত্রদের গুণাগুণ বিচার করা হয়, কিন্তু সে বিচার সাধারণতঃ হয় পরীক্ষার নম্বর হইতে। তাহার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যের উপর কিছুই জোর দেওয়া হয় না। তাই বোধ হয় এতদিনের সর্বজনীন শিক্ষাসত্ত্বেও আমরা সমাজে দেখিতেছি—

কবি সে ডাক্তারি করে, ডাক্তার দোকানী,
দোকানী সেতার সাধে,
সেতারী লাঙল কাঁধে
কৃষকের লয়েছে ভূমিকা,
প্রেমিকা সে হয়েছে লেখিকা।

তাই দেখি—

আমাদের জীবনে প্রচুর
একই ক্ষেতে চাষ হয় জুঁই ও কচুর।

একটানে পান করি সুরা আর সাবু
নানাবিধ বাবু,
আতরের ছিটা দিই ময়লা কাপড়ে
শতকরা আশী জন গড়ে।

আর্য-সভ্যতার যখন পতন আরম্ভ হইয়াছিল তখনও হয়তো ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শ ঠিকমতো অনুসৃত হইত না, মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণদের দীর্ঘ তালিকা হইতেই তাহা অনুমিত হয়। এইবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

গুরুর সম্মতি পাইলে গুরু-সমীপে শিষ্যের গমনের নাম উপনয়ন—ইহা ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রথম সোপান। গর্ভের মধ্যে জননী যেমন শিশুকে গ্রহণ করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যকে নিজের অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের অধ্যাত্ম সাধনা সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় জন্ম দান করেন। তাই ব্রহ্মচারী মাত্রেই দ্বিজ এবং গুরু পিতৃস্থানীয়। শুধু পিতৃস্থানীয় নয়, শিষ্যের জীবনে গুরুই সব। শঙ্করাচার্য তাঁহার গুরুস্তোত্রে বলিতেছেন—

গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিষ্যের আদর্শ। তিনি তাঁহার চরিত্র দিয়া উপদেশ দিয়া শিষ্যের মনে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন সেই পরিবেশে শিষ্য তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে বিকশিত হইত। সে যে হুবহু গুরুকে নকল করিত তাহা নয়, গুরু তাঁহার বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ধর্মের এই আদর্শ

সম্বন্ধে তাঁহার চিকাগো বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—The seed is put in the ground and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No. It becomes a plant, it develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth and the water and converts them into plant-substance and grows into a plant.

গুরুও তেমনি শিষ্যের অন্তরে একটা আদর্শ-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন মাত্র। সে পরিবেশের মূল সুর ছিল সত্যান্বেষণ—সত্যের প্রতি, ব্রহ্মের প্রতি মনকে উন্মুখ করিয়া তোলা। শিষ্য নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে নিজের মতো করিয়া ব্রহ্মোপলব্ধি করিবে, গুরু তাহাকে সে উপলব্ধির পথে পাথেয় দেবেন মাত্র। ইহা ছাড়া পরিচ্ছন্ন সুসভ্য জীবন, সুগঠিত স্বাস্থ্য, নিঃস্বার্থ কর্ম, স্বাবলম্বন, অহঙ্কার ত্যাগ, বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকৃত সাম্য অর্জনের প্রচেষ্টা প্রভৃতিও সে পরিবেশের অঙ্গ ছিল। সে পরিবেশের আর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল প্রকৃতি। লোকালয় হইতে দূরে শান্ত প্রকৃতির কোলে গুরুগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইত। তাহার নাম ছিল তপোবন। রবীন্দ্রনাথ এই তপোবন-বিষয়ের একটি সুরম্য আলোচনা করিয়াছেন। কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল,—ঠেলাঠেলি ছিল না।...তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয়, তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে

যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভ'রে তোলে তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়—"

উক্ত প্রবন্ধেই তিনি আর একটু পরে বলিতেছেন—"মানুষকে বেষ্টন ক'রে এই যে জগৎ প্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশঃ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা ক'রে মরে…"

এই সব কারণে গুরুগৃহ লোকালয় হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত হইত। আর্যসন্তানগণ শৈশবে এই শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে আদর্শচরিত্র গুরুসন্নিধানে শিক্ষার জন্য উপনীত হইতেন। মনুসংহিতায় আছে গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণের, গর্ভ-একাদশে ক্ষত্রিয়ের, এবং গর্ভ-দ্বাদশে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া কর্তব্য। অতি শৈশবকালে নিজ নিজ গৃহে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে তাহারা থাকিবে। ডাক্তার Alexis Carrel এবং অন্যান্য অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ যে পারিবারিক শিক্ষাকে শিশুর মানসিক গঠনের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়াছেন, সে শিক্ষাকে আর্যগণও প্রাধান্য দিয়াছিলেন। শৈশবকালে নিজ নিজ পরিবারে অতিবাহিত করিয়া তবে তাঁহারা গুরুগৃহে গমন করিতেন। সে গুরুগৃহ আধুনিক স্কুল বা হস্টেলের মতো ছিল না। তাহাও ছিল তাহাদেরই গৃহের মতো গৃহ। সেখানে আদর্শচরিত্র গুরুদেব গৃহকর্তা, জননী-সদৃশা গুরুপত্নী গৃহকর্ত্রী, সেখানেও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, সন্তানসন্ততি, গৃহপালিত পশুপক্ষী যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা গৃহেরই পরিবেশ। মাতৃঅঙ্কচ্যুত হইয়া সে হস্টেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বা বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারের কবলে পড়িত না। আর একটি স্নেহকোমল মাতৃঅঙ্কে স্থানলাভ করিত। গার্হস্থ্য-জীবনের সমষ্টি লইয়া সমাজ। সেইজন্য শিষ্যকে একটি আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া তাহাকে সেই পরিবারের

আপন-জন করিয়া লইয়া তবে শিক্ষা শুরু হইত। তাই অতি বাল্যকাল হইতেই সে পরকে আপন করিতে শিখিত। গুরু ও গুরুপত্নী নিঃস্বার্থ-ভাবে পুত্রবৎ তাহাকে পালন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার মনে এই সত্যটি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে পরের জন্যই সংসার, অনাত্মীয় অতিথিই সংসারে পূজ্যতম ব্যক্তি, অনাত্মীয় শিষ্যেরাও গুরুগৃহে পরম স্নেহভাজন। গুরুর গৃহ তাহারই গৃহ। প্রতিদিন গুরুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে গুরু তাহার মানসিক প্রকৃতির সেই স্বরূপটি জানিতে পারিতেন, যাহা না জানিলে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এক শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী নয়। কারণ প্রত্যেকটি শিষ্যের মনের গঠন, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। সেকালে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিয়া সমাজের কল্যাণে তাহাকে নিয়োগ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে সকলেই বুঝি জটাজুটধারী কমণ্ডলু-পাণি সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিয়া আসিত। মোটেই তাহা নয়। সমাজের সর্বস্তরের লোকের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। রাজা, প্রজা, বণিক্‌, ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা, সাধারণ গৃহস্থ, সব রকম লোকই সমাবর্তন-শেষে সমাজে আসিয়া প্রবেশ করিত। সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীর সংখ্যা বেশি ছিল না। যাহারা ছিল তাহারা প্রকৃতই আধ্যাত্মিক মার্গে বিচরণের যোগ্য; তাহাদের ব্যক্তিত্বই সন্ন্যাস-প্রবণ। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করাই ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইত একটি বিশেষ পটভূমিকায়, সমস্ত আর্যসভ্যতাই এই পটভূমিকার উপর অঙ্কিত। সে পটভূমিকা ব্রহ্মজ্ঞান, ইংরেজি করিয়া বলিলে বলিতে হয়—The Ultimate Reality, The Eternal Truth. বাল্যকাল হইতেই এই জ্ঞান তাহার মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইত যে, বাহিরের পৃথিবীতে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, প্রত্যেকটি সৃষ্টি প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র, এই স্বাতন্ত্র্যেই তাহার মহিমা, তাহার সার্থকতা, কিন্তু একথা ভুলিও না

যে সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছেন ব্রহ্ম, তিনিই নানারূপে নিখিল বিশ্বে নিজেকে বিকশিত করিয়াছেন, প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই তিনি আছেন, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মনে হইলেও আমরা সকলেই সেই এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের প্রকাশ। সমস্ত বিশ্ব যেন বহু বিচিত্র শাখা-পত্রবিশিষ্ট একটা বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষ, কিন্তু তাহার মূল ঊর্ধ্বে—ব্রহ্মে।

সনাতন এ অশ্বত্থ নিম্নে শাখা প্রসারিয়া
ঊর্ধ্বমূল রহে,
ইনি শুক্র, ইনি ব্রহ্ম, ইনিই অমৃত
সর্বশাস্ত্রে কহে ;
অতিক্রম কেহ এঁরে না করিতে পারে
সর্বভূত স্থিত এ আধারে।

শৈশব হইতে প্রকৃত সাম্যবাদের পটভূমিকায় প্রতিটি চরিত্র বিকশিত হইত বলিয়া, ধন জন জীবন যৌবন সমস্তই নশ্বর, ব্রহ্মই শুধু শাশ্বত, অহরহ এই সত্যকে সত্যদ্রষ্টা ঋষির সহায়তায় উপলব্ধি করিতে হইত বলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সম্যক্ বিকাশ সত্ত্বেও বিরোধ বাধিত না, অশান্তির সম্ভাবনা কম থাকিত। অন্তরের সাম্যভাবই শান্তির মূল কথা। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অনেক দিন পূর্বে (কার্তিক, ১৩৩০) 'সাম্যদর্শন' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন—"যিনি চিৎ—যিনি পুরুষ—তিনিই আত্মা। তাঁহার সাম্যই সাধনীয়। কে সাধক আছ, সেই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পার? কে সাধক আছ, অন্তরের সহিত কেবল কথায় নহে, কেবল বাহ্যিক আচারে নহে, অন্তরের সঙ্গে সেই সাম্যে আত্মসমর্পণ করিতে পার? আমি জানি বর্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ যুবক বলিবেন 'আমি আছি' 'আমি আছি'—কিন্তু তাহা কি প্রকৃত? যদি প্রকৃত হইত তাহা হইলে সংসার অনেকাংশে স্বর্গতুল্য হইত, আত্মদ্রোহ থাকিত না, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত। অতএব প্রকৃত নহে। সাম্য উত্তম। ধূর্ততায়, ভণ্ডতায়, বাকচাতুর্যে সে

উত্তম বস্তু লাভ হয় না। যাহা উত্তম তাহা পাইতে হইলে উত্তম ভাব উত্তম সাধনা চাই। সকল জাতি মিশিয়া একত্র পান-ভোজন করা, আদান-প্রদান করা, মুখে 'ভাই' 'ভাই' বলিয়া আলিঙ্গন করা, ইহা তো বাহ্য আচরণ, অন্তরের ভাবের বিপরীত বাহ্য আচরণই ভণ্ডতা। অন্তর সাম্যের প্রতি ধাবিত হইলে বৈষম্য স্বয়ং হীনবল হয়, যেমন সাম্যের প্রতিষ্ঠা তেমনি বৈষম্যের বিসর্জন—যতটুকু সাম্যের বৃদ্ধি ততটুকুই বৈষম্যের ক্ষয়, এই অনুপাতে যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে প্রথমে অন্তর পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রাকৃত বৈষম্যে যাহার মন পূর্ণ সে ব্যক্তি বাহ্য আচরণে যতই সাম্য-দর্শনের পরিচয় প্রদান করুক, তাহার তাহা ভণ্ডতা মাত্র, তাহা সাম্য-সাধনা নহে। সাম্যদর্শন বৈষম্যের ভিতর দিয়াই করিতে হয়, বৈষম্যসমূহকে একত্র করিয়া অন্তরে আবদ্ধ করিতে হয়, অন্তরেই তাহাকে বিলীন করিতে হয়। তাহাতে অন্তরেই সাম্যের নির্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যতদিন বৈষম্য অন্তরে বিলীন না হইতেছে ততদিন সাম্যের ছায়াদর্শনও ঘটে না। সাম্যের একটা নকল মাত্র লোককে দেখান হয়, যেমন বাঙ্গালার বারবণিতা সীতা সাবিত্রী সাজিয়া থাকে, সেইরূপ সাম্য-দর্শনের একটা সাজ পৃথিবীতে চলিয়াছে। যে সাম্য মহৎ উচ্চ পবিত্র সে সাম্য এই নকল সাম্য নহে ....."

অন্তর পরিষ্কার করিয়া প্রকৃত সাম্য-সাধনাই ছিল সেকালের শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ছিল বলিয়াই শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। আজকাল শিক্ষার লক্ষ্য আধিভৌতিক সুখ-সুবিধা—লেখাপড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। গাড়ি-ঘোড়া চড়িবার জন্য আমরা যেন-তেন-প্রকারেণ একটা ডিগ্রি লাভ করিতে যাই, ডিগ্রি লাভ করিয়া দেখি গাড়ি-ঘোড়া তো দূরের কথা অন্নবস্ত্রের সংস্থান পর্যন্ত করিতে পারিতেছি না। সকলেই চাকুরি চাই। বহুকাল পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'সভ্যতার সোপানে, না জাহান্নমের পথে' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে বাঙালী জাতির

চারিত্রিক দোষ-বিশ্লেষণ করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় অর্থার্জনের সকল রকম পথই বাঙ্গালী নিজের অকর্মণ্যতা ও নিশ্চেষ্টতায় রুদ্ধ করিতেছে। বাহির হইতে দেশে ধনাগম হইতেছে না। অথচ অপব্যয় করিতে বাঙ্গালীর কুণ্ঠা নাই······"

দোষ বাঙালীর নয়, দোষ শিক্ষার। যে শিক্ষার বনিয়াদ জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার এই পরিণতি অনিবার্য। সেকালে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কোনও বস্তু বা বিষয়সম্পত্তি লাভ নয়, ব্রহ্মলাভ। শৈশব হইতেই গুরু এই আকাঙ্ক্ষাটা শিষ্যের মনে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মলাভের জন্য ডিগ্রির প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন চরিত্রের, পুঁথিগত বিদ্যাও অপ্রয়োজনীয়। উপনিষদের ঋষি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন—

অসংযমী, দুশ্চরিত্র অস্থির, অসমাহিত
অধীর অশান্তচিত্ত যিনি,
জ্ঞানী হইলেও এঁরে পাবেন না তিনি।

গুরু যখন দেখিতেন শিষ্য সংযমী চরিত্রবান হইয়াছেন তখনই তাঁহাকে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এই অনুমতিই ছিল সমাবর্তন, ইহাই ছিল তখন সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র।

ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ করিয়া সমাজের সহিত সেই ব্যক্তিটি যাহাতে খাপ খায় এ বিষয়েও তাঁহারা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সামাজিক অশান্তির মূলে থাকে অহঙ্কার, কামনা, এবং তজ্জনিত অসাম্যবোধ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, এমন কি ব্রহ্ম সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিলেও, অহঙ্কার, কামনা, অসাম্যবোধ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া বা সে সম্বন্ধে আগ্রহ জাগরিত হওয়া সহজসাধ্য নয়, সারাজীবন সাধনা করিলেও অজ্ঞানতার তিমির দূর হয় না। তাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অহঙ্কার দূর করিবার একটা সহজ পন্থা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে হইত, গৃহস্থের নিকট ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করিয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে

স্বীকার করিতে হইত যে অপরের দাক্ষিণ্য ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না। এই বিনয়, এই সকৃতজ্ঞ নম্র মনোভাব না থাকিলে সমাজ-সংহতি সুন্দর শান্তিপূর্ণ হইতে পারে না।

আজকাল ভিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজেও একটা কুসংস্কার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ যে ভিক্ষা-পরাঙ্মুখ তাহা নহেন। আমরা বই চাহিয়া পড়ি, সুপারিশ ভিক্ষা করি, 'কন্‌সেসন' ভিক্ষা করি, ধার লইবার ছুতায় টাকাও ভিক্ষা করি —একটু মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে জীবনের প্রতিপদেই "I have the honour to beg"—ইহাই আমাদের জপমন্ত্র, কিন্তু ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার বেলায় আমাদের ইকনমিক্ তত্ত্বজ্ঞান জাগিয়া উঠে, আমরা তখন idleness-কে প্রশ্রয় দিতে চাই না। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের যে সভ্যতাকে লইয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াই সেই সভ্যতায় ভিক্ষা হীনবৃত্তি নহে, চরিত্রগঠনের এবং মুক্তিলাভের উপায়। আমাদের দেশের মহাপুরুষরা সকলেই ভিক্ষুক। একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে বর্তমান যুগে আমরা খুব কম লোকই মহাপুরুষ হইতে পারিয়াছি, কিন্তু যন্ত্রসভ্যতা আমাদের প্রায় সকলকেই হীনতম ভিক্ষুকের পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে, সেইজন্যই বোধ হয় একজন ভিক্ষুক আর একজন ভিক্ষুকের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

বর্ণাশ্রমধর্মে ব্রহ্মচারীরা ভিক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু নিজের জন্য নহে, আশ্রমের জন্য। গৃহস্থগণও ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষা দেওয়া গার্হস্থ্য-জীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এখনও গৃহস্থেরা যে কর গভর্ণমেণ্টকে দেন তাহারই একটা অংশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়। সে নির্দেশের উপর দাতা বা গ্রহীতার কোন হাত থাকে না। দেশের শাসনপরিষদ অনেক সময় নিজের খেয়ালখুশী-অনুসারে বাজেট করিয়া শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। এ ব্যবস্থায় সব সময় যে সুফল ফলে না, সব সময় যে সুবিচার হয় না, তাহা আমরা প্রত্যহ অনুভব

করিতেছি। সেকালে গৃহস্থেরা শিক্ষার জন্য যাহা দিতেন তাহার কিছুটা অংশ শিক্ষার্থীদের হাতেই দিতেন। ভিক্ষা দ্বারা আর একটা উপকারও হইত। যে গার্হস্থ্য-আশ্রমে ব্রহ্মচারীকে পরে প্রবেশ করিতে হইবে প্রতিদিন কয়েকটি গৃহস্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহার সুখ দুঃখ আদর্শ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। সে সংসারের সহিত নির্লিপ্ত থাকিয়াও বুঝিতে পারিত সাংসারিক ব্যাপারে কত ধানে কত চাল হয়। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমেও এ ধারণা করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহারা পাইত কারণ আশ্রমের সমস্ত কাজই তাহাদের নিজের হাতে করিতে হইত। স্বাবলম্বন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রধান শিক্ষা ছিল।

বন হইতে কাঠ কাটিয়া যজ্ঞাগ্নির জন্য সমিধ সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া গো-সেবা, আশ্রমকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, কৃষিকর্মের সমস্ত কাজই ব্রহ্মচারীকে করিতে হইত। তাহার দিনচর্যাই ছিল কর্মময়। Dignity of Labour, Self-help প্রভৃতির উপকারিতা বক্তৃতা দিয়া তাহাদের বুঝাইবার প্রয়োজন হইত না। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিয়া, প্রকৃতির নানা রহস্যের আভাস পাইয়া প্রকৃতির রহস্য-ভাণ্ডারে নিজেই নিত্য নব আবিষ্কার করিয়া সে সেই উপায়ে আনন্দময় জ্ঞান আহরণ করিত যাহা আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। রুশো বলিয়াছেন—Don't hurt him by the various sciences, but give him a taste of them and the methods for learning them.... Let him not be taught science but discover it. If you ever substitute authority for reason in his mind he will no longer reason ; he will be nothing but the playing of other people's opinion.

আচার্য কৃপালনী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন—From Bacon, Montaigne, John Locke, the Encyclopædists up to the present day

philosophers and educationists it has been one long protest against scholasticism and its divorce from Nature and Reality.

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে শিক্ষাবিধি প্রচলিত ছিল তাহার সবটাই ছিল Nature এবং Reality। প্রকৃতির ক্রোড়েই তাহার শিক্ষা হইত এবং যে Reality-র সম্বন্ধে সে উপদেশ লাভ করিত তাহাই একমাত্র Reality, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইত বলিয়া যে মোহ সর্বপ্রকার অনর্থের মূল, সে মোহ তাহার চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিবার অবকাশ পাইত না। Alexis Carrel বলিয়াছেন বর্তমান জগতে সাধারণ মানুষ আত্মসম্মানহীন, অসহায়, nameless grains of dust। কিন্তু শিক্ষা যদি সত্য আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে হয়, শিক্ষা যদি বারংবার আশ্বাস দেয়—তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি মহতো মহীয়ান্, তুমি অক্ষয় অমর, তুমিই ব্রহ্ম, সাধনা করিলেই তুমি তোমার স্বরূপকে উপলব্ধি করিবে, তোমার বিকশিত বৈশিষ্ট্য তোমাকে যে পথেই চালিত করুক না কেন, তুমি একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিবে তোমার লক্ষ্য—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনো খানে"। এই শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থী যদি বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ, অহঙ্কারশূন্য হইতে পারে তাহা হইলে নিজেকে কিছুতেই সে আত্ম-সম্মানহীন অসহায় nameless grains of dust মনে করিবে না। তাহার বরং মনে হইবে—আমি তুচ্ছ নই, সোঽহম্। মনে হইবে—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করিবেন, আর্যদের শিক্ষাবিধি যদি এমনই চমৎকার ছিল, তাহা হইলে আর্যসভ্যতার পতন হইল কেন? ইহার

ঐতিহাসিক একাধিক কারণ আছে, সে সব বিবৃত করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না। উত্তরে একটি কথাই শুধু বলিব আদর্শচরিত্র মানবের জীবনেও যেমন উত্থান-পতন আছে আদর্শ সভ্যতার জীবনেও তেমনি উত্থান-পতন আছে। ইহা অনিবার্য। আধিভৌতিক মানদণ্ডে বিচার করিলে মনে হইতে পারে আর্যসভ্যতার পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার আদর্শের মৃত্যু হয় নাই। চারি সহস্র বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও এ সভ্যতা এখনও সজীব আছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"Sect after sect arose in India and seemed to shake the religion of the Vedas to its very foundation, but like the waters of the sea-shore in a tremendous earthquake it receded only for a while, only to return in an all absorbing flood, a thousand times more vigorous and when the tumult of the rush was over, these sects were all sucked in, absorbed and assimilated into the immense body of the mother faith...."

এই mother faith বহু বিচিত্ররূপে এখনও ভারতের সর্বত্র বিদ্যমান। বারট্রাণ্ড রাসেল, জোয়াড্, আলডুস্ হাক্স্‌লি, রমঁ্যা রলঁা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের লেখা পড়িলে মনে হয় ভারতের বাহিরেও ইহার মহিমা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। এ দেশের মুষ্টিমেয় ট্যাঁস্-মার্কা কিছু লোকের মধ্যে এই faith-এর মহত্ত্ব হয়তো কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্তরে আর্যধর্মের মহত্ত্ব আর্যসভ্যতার আদর্শ আজও দেদীপ্যমান। মূর্খতম ভারতীয় হিন্দুর সহিতও আলাপ করিয়া দেখুন, দেখিবেন তাহার অন্তরের অন্তরতম তন্ত্রে এই সভ্যতার সুরটি ঠিক বাজিতেছে।

আমি অবশ্য একথা বলিতে চাহি না যে এই আর্যধর্মের শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করিলে প্রত্যেকটি মানুষ মহাপুরুষ হইয়া উঠিবে। কোনও

শিক্ষার আদর্শই সমস্ত মানুষকে একযোগে মহাপুরুষে পরিণত করিতে পারিবে না। মানুষ বড় জটিল জীব। প্রত্যেককে নিজের সাধনায় নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে ধীরে ধীরে জটিলতা-মুক্ত হইতে হয়। যে মহাভারতে আমরা আর্যসভ্যতার একটা চিত্র দেখিতে পাই সেই মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র কি মহাপুরুষ-চরিত? হিংসা-জর্জরিত কৌরবদের সহিত ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদের যুদ্ধই তাহার বিষয়বস্তু। কিন্তু পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব-কীর্তনই মহাভারতের চরম বক্তব্য নহে। মহাভারতের চরম বক্তব্য শান্তিপর্বে, যেখানে রাজ্যলাভ করিয়াও যুধিষ্ঠির অনুতপ্ত চিত্তে আত্মীয়-নিধন-শোকে আকুল হইয়া সংসার-ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট লইয়া গিয়াছেন, যেখানে পিতামহ তাঁহাকে স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে নানা গল্প বলিয়া উপদেশ দিতেছেন—"রাজা প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া আত্মজয়ী হইবেন, তাহার পর শত্রু জয় করিবেন। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম," যেখানে তিনি বলিতেছেন—"জীবের বিনাশ নাই, দেহ নষ্ট হইলে জীব দেহান্তরে গমন করে। কাষ্ঠ দগ্ধ হইবার পর অগ্নি যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীর ত্যাগের পর জীবও সেইরূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান করে। শরীরব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কার্য নির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব করেন। সত্যই ব্রহ্ম ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃষ্টি ও পালন করে।"

এই সত্যধর্মই আর্যধর্ম, ইহারই উপর সেকালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য যে এ শিক্ষা সত্ত্বেও সেকালে দুষ্ট লোকের, বা অসুখী লোকের অভাব ছিল না। শিক্ষা বা ধর্ম একটা আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারে। সেকালে শিক্ষার আদর্শ কি ছিল তাহাই আমি এ প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অনেকে বলেন এই বৈরাগ্যমূলক মনোবৃত্তিকেই আধুনিক যুগে

escapism বলে। এই পলায়নী মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত ?

আর্যশিক্ষা যে বৈরাগ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে, গীতায় উপনিষদে যে বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য কীর্তিত তাহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে, তাহা সুস্থ সবল কর্মীর মনোবৃত্তি, তাহা অপরাজেয় যোদ্ধার মনোবৃত্তি। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার কর্মকথা পুস্তকে বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটি চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। আর্যসভ্যতার মর্মবাণী সে আলোচনায় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"কর্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই, আসক্তি ত্যাগ কর; অর্থাৎ কর্তব্যবোধে কর্মাচরণ কর, ফল কামনা করিও না, কর্মত্যাগে কিন্তু তোমার অধিকার নাই। ইহাই ছিল সেকালের বৈরাগ্য, সেকালের কর্মসন্ন্যাস। সে কালের যে কালে মনুষ্যজীবনের মূল্য ছিল, মনুষ্য নির্ভীকচিত্তে বিশ্বজগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিত; জগতে যাহা কিছু আছে তাহা আত্মার ঈশিত দ্বারা আবৃত এই মহাবাক্য যখন উচ্চারিত হইয়াছিল। শুদ্ধজ্ঞান এই বৈরাগ্যের প্রসূতি, ভক্তি তৃপ্তি ও মুক্তি এই বৈরাগ্যের ফল।······সংসারের শোণিত-কর্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষালাভ হয় তাহারই চরম ফল দুঃখমুক্তি···"

এই মনোভাব পলায়নী মনোভাব নহে।

শ্রদ্ধেয় অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় কিছুকাল পূর্বে "বেদ-সংহিতায় নৈতিক আদর্শ" নামক চমৎকার একটি প্রবন্ধে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ প্রভৃতি হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, প্রাচীন আর্যগণের জীবনদর্শন কত সুস্থ, কত সবল, কত প্রাণ-দীপ্ত ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তির আভাসমাত্র তাহাতে নাই। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল "পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ

শতম্"—আমরা যেন শত শরৎ দেখি, আমরা যেন শতবর্ষ বাঁচি। জীবনের বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহারা পলায়নপর হন নাই, নির্ভীক-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং
বীরয়ধ্বং এ তরতা সখায়ঃ।

প্রস্তরসঙ্কুল জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। বন্ধুগণ সংহত শক্তিতে অগ্রসর হও, বীরের মতো চল। এ নদী উত্তীর্ণ হও।

দেবতার নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল—

তুমি তেজস্বরূপ, আমাকে তেজ দাও,
তুমি বীর্যস্বরূপ, আমাকে বীর্য দাও,
তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বল দাও,
তুমি ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজঃ দাও,
তুমি মন্যুস্বরূপ, আমাকে মন্যু দাও,
তুমি সাহসস্বরূপ, আমাকে সাহস দাও।

জীবনযুদ্ধে তাঁহারা বীরের মতো অগ্রসর হইয়া জয় কামনা করিতেন—

যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ
যুদ্ধন্তে যস্যামা ক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ
সা নো ভূমি এ নুদতাং সপত্না ন সপত্নং
মা পৃথিবী কৃণোতু।

যাহাতে মানবেরা কলরবের সহিত গায়, নৃত্য করে, যাহাতে তাহারা যুদ্ধ করে, যাহাতে রণগর্জন হয়, দুন্দুভি বাজে, সে ভূমি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সরাইয়া আমাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী করুক। বলা বাহুল্য ইহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে। কিন্তু তাঁহারা যে পাপপুণ্যবোধহীন বিষয়ী ছিলেন না তাহার প্রমাণও ওই ঋগ্বেদেই আছে। মানুষ পৃথিবী ভোগ করিবে সত্যের পথে ধর্মের পথে থাকিয়া, ওই বৈদিক ঋষিগণই প্রার্থনা করিতেছেন—"যাহা ভিন্ন কোন কর্ম করা যায় না আমার সেই মন মঙ্গলেচ্ছাযুক্ত হোক। হে পূজ্য দেবগণ, আমরা

যেন কর্ণ দ্বারা যাহা কল্যাণময় তাহা শুনি, আমরা যেন চক্ষু দ্বারা যাহা কল্যাণময় তাহা দেখি।”

সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনকে প্রাচীন আর্যগণ যে জীবন-দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শান্তি ও আনন্দের সন্ধান করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু নমুনা দিতে গিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল। পরিশেষে একটি কথা শুধু বলিতে চাই। কেহ যেন মনে না করেন যে অতীতকে ফিরাইয়া আনিয়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপক্ষে আমি ওকালতি করিতেছি। সে প্রয়াস যে হাস্যকর তাহা আমি জানি। ইহাও আমি জানি বর্তমানই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। বর্তমানের সমস্যা, বর্তমানের জীবন-স্পন্দন, বর্তমানের সুখ-দুঃখ-জটিলতার একটা বিভিন্নতা আছে, অতীতের মহিমাকীর্তন করিয়া বর্তমানের সে বৈশিষ্ট্য আমি ভুলিয়া যাইতে চাহি না। কিন্তু এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনভূমি বর্তমান। অতীতের অভিজ্ঞতাকে বর্তমান ত্যাগ করিতে পারে না, যে সব শাশ্বত সত্য অতীতকালে আবিষ্কৃত হইয়া মানবকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছিল তাহা অতীতকালে হইয়াছিল বলিয়াই বর্জনীয় নহে। বর্তমান যুগের সমস্যাগুলিকেও অতীত অভিজ্ঞতা দিয়াই সমাধান করিতে হইবে। অতীতকালে লব্ধ জ্ঞানকেই বর্তমান কালোপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমাদের বারংবার এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে কথা আমাদের দেশের জ্ঞানীরা বহুপূর্বে বহুবার বলিয়াছেন যে ধর্মই আমাদের জীবনপথের প্রধান পাথেয়। এ যুগের মনীষীরাও ঠিক ওই কথাই বলিতেছেন। Joad-এর *God and Evil* পুস্তক হইতে দুইচারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—Men, in short, require to be comforted and reassured, and for this purpose they invoke forces of reassurance which are felt to be both eternal and unchanging. From this conflict of and

combination between these various factors God emerges to satisfy our desires and fulfil our needs. আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই ধর্ম চাই, ভগবান চাই—এ তথ্য চিরপুরাতন, চিরনূতন।

কি করিয়া ধর্মবোধকে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে জাগ্রত করা সম্ভব, আদৌ তাহা সম্ভব কি না, তাহার বাধা কোথায়, পরবর্তী প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিব।

(তিন)

বর্তমানে কি করিয়া ধর্মকে আমাদের শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি তাহার অনুকূল কি না, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে যে সব মনীষী আমাদের নব্যভারতের নির্মাতা, ধর্মসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজা রামমোহন রায় যে প্রাচীন বেদান্ত ও উপনিষদ্‌কেই আমাদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন একথা সুবিদিত।

বঙ্কিমচন্দ্রও বহুকাল পূর্বে তাঁহার ধর্মতত্ত্ব নামক পুস্তকে বলিয়াছেন —ধর্ম বলিতে ভারতবাসীর মনে যে ভাবের উদয় হয় ইংরেজী 'রিলিজন' শব্দটি সে ভাবের বাহক নয়। তিনি বলিয়াছেন সংক্ষেপে ধর্মের অর্থ পূর্ণ-বিকশিত মনুষ্যত্ব। উক্ত পুস্তকেই তিনি গুরুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"আমিও সেই আর্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে যাইতেছি। তিনচারি হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, 'না, তাহা চলিবে না। আমাদের বিধিগুলির সর্বাঙ্গ বজায়

রাখিয়া যদি এখন চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মের বিপরীতাচরণ হইবে।' হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেন না মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি।...কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্যজাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ, সকল লইয়াই ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময় ধর্ম কি আছে?"

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, সাহিত্য ও সাধনা এই ধর্মেরই মহিমা প্রচার করিয়া জগতের শিক্ষিত সমাজে ভারতের বৈশিষ্ট্যকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতে ও ভারতের বাহিরে তিনি এই ধর্মের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ নানা দৃষ্টিকোণ হইতে করিয়াছেন। কিন্তু শিকাগো বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের সারমর্মটি তিনি বলিয়াছিলেন। "Unity in Variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Every other religion lays down certain fixed dogmas and tries to force the society to adopt them....The Hindus have discovered that the absolute can only be realised or thought of or stated through the relative and the images; crosses and crescents are simply so many symbols, so many pegs to hang the spiritual ideas on.

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাশতদল বিকশিত হইয়াছে এই ভারতীয় ধর্মের মৃণালশীর্ষে। ভারতীয় ধর্মই যেন আধুনিক যুগে রবীন্দ্রসাহিত্য-রূপে নূতন মূর্তিতে, নূতন বর্ণে, নূতন ছন্দে, নূতন দ্যোতনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ধর্মই তাঁহার কবিতায় গানে গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে প্রার্থনায় ওতপ্রোত হইয়া আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার সম্মুখে সনাতন

অথচ অভিনব বিস্ময়লোকের সন্ধান দিয়াছে। বস্তুতঃ, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে শাশ্বত দেবতাকে তিনি ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারই আরতি তিনি সারাজীবন করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গাহিয়াছিলেন

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসীক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসনপাশে
প্রেম-হার হয় গাঁথা
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে, ভারতভাগ্য-বিধাতা।

এই ভারতীয় ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে তিনি যে ক্ষুদ্র কবিতাটিতে রূপায়িত করিয়াছেন তাহা আপনারা পড়িয়াছেন, তবু এই প্রসঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার রণ করিতে পারিলাম না—

হে ভারত, পতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে,
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার ;
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ-ত্যজি' সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

এই ব্রহ্মময় সনাতন ধর্ম মহাত্মা গান্ধীরও জীবনের প্রেরণা। ইহার মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, আত্মশক্তিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি, একমাত্র শক্তি। এই সনাতন ধর্মই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিল যে, প্রেমই সভ্য-মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। গীতার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "I learnt Sanskrit to enable me to read the Gita. To-day the Gita is not only my Bible or my Koran—it is my mother. I lost my earthly mother who gave me birth long ago, but this eternal mother has completely filled her place by my side ever since. She has never changed, she has never failed. When I am in difficulty or distress I seek refuge in her bosom.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা হইয়াছেন এই ধর্মেরই প্রভাবে। তাঁহার সমস্ত জীবন এই জননীর নির্দেশেই পরিচালিত হইয়া বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রের যাঁহারা কর্ণধার তাঁহাদেরও জীবনাদর্শ ভারতীয় সনাতন ধর্মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্ত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার কিছু কিছু আমেজ হয়তো কাহারও কাহারও চরিত্রে লাগিয়াছে, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই তাঁহাদেরও চরিত্রের মূল সুরটা যে ভারতীয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু যদিও তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন—I am an exotic plant : neither of the East nor of the West, কিন্তু তাঁহার সমস্ত কর্ম সমস্ত প্রেরণা সমস্ত চিন্তার উৎস ভারতীয় ধর্মেরই মর্মবাণী। তাঁহার *Discovery of India* গ্রন্থে লক্ষ্য করি উপনিষদের মহিমা তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনকে বারংবার বিচলিত করিয়াছে। উপনিষদ্ সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদের অভিমত তিনি সাগ্রহে এবং সগর্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শোপেন-হাওয়ার যেখানে বলিতেছেন—"From every sentence of the Upanishads deep, original and sublime thoughts

arise and the whole is pervaded by a high and holy and earnest spirit. In the whole world there is no study so beneficial and elevating as that of the Upanishads. They are products of the highest wisdom. It is destined sooner or later to become the faith of the people. The study of the Upanishads has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

যেখানে তিনি Max Muller-এর মত উদ্ধৃত করিতেছেন, "The Upanishads are to me like the light of the morning, like the pure air of the mountains, so simple, so true if once understood...."

যেখানে তিনি আইরিশ কবি A.E.-র অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন—"The Bhagavat Gita and the Upanishads contain such godlike fullness of Wisdom on all things that I feel the authors must have looked with calm remembrance back through a thousand passionate lives, full of feverish strife for and with shadows, ere they could have written with such certainty of things which the soul feels to be sure...."

সেখানে তাঁহার মনও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষির সহিত সুর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে চরৈবেতি, চরৈবেতি। পথিক চল, চল।

যেখানে তিনি বলিতেছেন—I have loved life and it attracts me still and in my own way, I seek to experience it, though many invisible barriers have grown up which surround me. But that very desire leads me to play with life, to peep over its edges, not to be a slave to it, so that we may value each other all the more. Perhaps I ought to have

been an aviator, so that when the slowness and dullness of life overcame me I could have rushed into the tumult of the clouds and said to myself—

'I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath
A waste of breath the years behind,
In balance with tbis life this death'

সেখানে তিনি সত্য-সন্ধী ভূমা-উন্মুখ ভারতীয় সাধকেরই সমগোত্র। কারণ ভারতীয় ধর্ম negation of life নহে, তাহা নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে জীবনকে অবলম্বন করিয়াই সত্যান্বেষণ।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা সত্য আমাদের বর্তমান যুগের অন্য নেতাদের সম্বন্ধেও তাহা সত্য। পণ্ডিত নেহেরুই তাঁহার *Discovery of India* পুস্তকে শ্রদ্ধেয় সি. রাজাগোপালাচারীর উপনিষদ্ সম্বন্ধে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজাগোপালাচারী বলিতেছেন—"The spacious imagination, the majestic sweep of thought and the almost reckless spirit of exploration with which, urged by other compelling thirst for truth, the Upanishad teachers and pupils dig into the 'open secret' of the universe, make this most ancient world's holy books still the most modern and most satisfying."

আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বর্তমানে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে সারাজীবন তিনি ভারতীয় ধর্মেরই মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম মানব-ধর্ম, জীবন-ধর্ম। তাহা কোন doctrine বা dogma-র কারাগারে আবদ্ধ শুষ্ক নিয়মাবলীমাত্র নহে।

আমাদের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও বিশুদ্ধ ভারতীয় ধর্মেরই সাধক। শুধু তিনি কেন, উত্তরপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী (বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল প্রবীণ পণ্ডিত আণে, আচার্য নরেন্দ্রদেব, এমন কি ভিন্নধর্মাবলম্বী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফ্ফর খাঁ, মহম্মদ আসফ আলী, বাঙলার বর্তমান রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের জীবনাদর্শ ও রচনাবলী হইতে প্রমাণ করা খুবই সহজ যে ভারতের সনাতন ধর্ম—যাহাকে রবীন্দ্রনাথ মানবধর্ম বলিয়াছেন—যাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—It is the same light coming through glasses of different colours—সেই ধর্ম ইঁহাদেরও প্রত্যেকেরই জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। সে ধর্ম সুস্থ সবল অনাসক্ত স্বাধীন মনুষ্যত্বের উদ্বোধক। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যখন এইসব মনীষীর প্রাণপণ প্রয়াসে ভারতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তখন যে ধর্ম ভারতীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড সেই ধর্মটাই শিক্ষা হইতে বাদ পড়িয়া গেল।

আমাদের কন্স্টিটিউশনের ২২ নং আর্টিকেলে বলা হইয়াছে—

(১) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds.

(২) No person attending any educational institution recognised by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person, or if such person is a minor, his gurdian has given a consent thereto.

ইহাই বর্তমান আইন। Religion সম্বন্ধে এ আইন অন্যায় নহে, কিন্তু যে ধর্মের স্বরূপ আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস

পাইয়াছি তাহা religion নহে, তাহা জীবনকে অবলম্বন করিয়া সত্য-সন্ধান, তাহা সুস্থ মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা। এক হিসাবে এই এক-পেশে শিক্ষার মাধ্যমেও আমরা আমাদের অজ্ঞাত-সারে সেই ধর্মই অনুসরণ করিতেছি। রসায়নে, পদার্থবিদ্যায়, জীব-বিজ্ঞানে, গণিতে, সাহিত্যে, দর্শনে আমরা সত্যকেই অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু সেই সত্য জীবনের চরম সত্যের সহিত অসংলগ্ন বলিয়া আমাদের জীবনে তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আমরা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য মুখস্থ করিয়া ডিগ্রিলাভের কাজে তাহাকে নিয়োগ করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইতেছি। যাহার মূল্য অন্তরের আনন্দিত উপলব্ধিতে, যে উপলব্ধি ব্যতীত সুস্থ সুন্দর জীবন অসম্ভব, তাহার মূল্য বাহিরের বাজারে খুঁজিতে গিয়া হতাশ হইতেছি। এই ধর্মহীন শিক্ষাই আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি।

একথা মিথ্যা নয় যে রিলিজনের নামে পৃথিবীর সর্বত্র বহু রক্তপাত হইয়াছে, ইহাও সত্য যে এই রিলিজনের ওজুহাতেই মাত্র কিছুদিন পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের পাশবিকতা ঘৃণ্যতমরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু আমি যে ধর্মের কথা বলিতেছি তাহা এ ধরনের religion-এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর যে University Education Commission গঠিত হইয়াছিল (১৯৪৮-৪৯), অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ যে কমিশনের নেতা ছিলেন সে কমিশনও এ বিষয়ে সচেতন।

কমিশন বলিতেছেন—What is responsible for the communal excesses is not religion as such but the ignorance, bigotry and selfishness with which religion gets mixed up. Selfish people in an attitude of cynical opportunism use religion for their own sinister ends. In his thirty-second year Napoleon

professed himself ready to adopt any religion which might serve his purpose.

তাঁহারা বলিতেছেন যে রিলিজনের এই দ্বন্দ্ব-প্রবণতার জন্যই অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের মতো আমাদের রাষ্ট্রও ধর্ম-নিরপেক্ষ secular হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের পার্লামেণ্টে যখন বিতর্ক হইতেছিল তখন ডাক্তার আম্বেদকার বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত রিলিজনের সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবার সামর্থ্য রাষ্ট্রের নাই। একটি রিলিজনকে রাষ্ট্রধর্মের প্রাধান্য দিয়া অন্যান্য রিলিজনকে ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছাও রাষ্ট্রের হওয়া উচিত নয়, তাই তাঁহারা ধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়াছেন। নিরপেক্ষতা যে রাষ্ট্রের প্রধান গুণ হওয়া উচিত তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ধর্মের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইলেও ভাষার ক্ষেত্রে তাঁহারা নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই, একটি ভাষাকেই তাঁহারা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধেই করিয়াছেন এবং হিন্দীকে নির্বাচন করিয়া তাঁহারা যে অন্যায় করিয়াছেন তাহাও আমি বলিতেছি না, আমার বক্তব্য যে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাঁহারা যেমন একটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলেন তেমনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই উদারতম ভারত-ধর্মের অনুশীলনকেও শিক্ষা-ব্যবস্থায় অন্ততঃ স্থান দিতে পারিতেন। Religion ও secular state সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া University Commission অবশ্য ভারতের উদার ধর্মের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন যে আমাদের রাষ্ট্র যদিও ধর্ম-নিরপেক্ষ, কিন্তু "It does not mean that nothing is sacred or worthy of reverence. It does not say that all our activities are profane and devoted to the sordid ideals of selfish advancement. We do not accept a purely scientific materialism as the philosophy of the state. That would be to violate our nature, our 'Svabhava', our characteristic genius, our 'Svadharma'. Though we have no state religion,

we cannot forget that a deeply religious strain has run throughout our histoty like a golden thread. Besides, in the preamble to our constitution we have the makings of a national faith, a national way of life which is essentially democratic and religious."

অর্থাৎ তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ধর্মের উদার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

একথাও তাঁহারা বলিয়াছেন—"The adoption of the Indian outlook on religion is not inconsistent with the principles of our constitution."

ইহার পর তাঁহারা Indian Outlook on Religion সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতিশয় চমৎকার। তাহাতে একথাও স্বীকৃত হইয়াছে যে—"If religion is a mother of realisation it cannot be reached through a mere knowledge of dogmas. It is attained through discipline, training, Sadhana. What we need is not formal religious education but spiritual training...."

কিন্তু এই spiritual training কি করিয়া লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। কেবল নিজের চেষ্টায়—যাহাকে তাঁহারা self-effort বলিয়াছেন—আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া শক্ত। কোনও শিক্ষার পথেই কেবলমাত্র self-effort দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় না। এমন কি চুরি-বিদ্যা পকেটকাটা-বিদ্যার জন্যও গুরু চাই। দুই-একজন অসাধারণ ছাত্র হয়তো self-effort দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ ছাত্রেরা তাহা পারিবে না। University Commission যে শৃঙ্খলা, যে সংযম, যে সাধনার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, যে স্বাধীন জিজ্ঞাসু সত্তার উদ্ভব তাঁহারা ছাত্রদের মধ্যে

মূর্ত দেখিতে চাহিয়াছেন, অন্য ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব তাঁহারা প্রতি ভারতবাসীর নিকট প্রত্যাশা করেন তাহা কিছুতেই সম্ভব হইবে না যদি ছাত্রদের বাল্যকাল হইতে একটা আদর্শ-অনুকূল পরিবেশে মানুষ না করা হয়। সেকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এই পরিবেশ ছিল। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে তাহার কোনও ব্যবস্থা নাই। University Commission অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের আলোচনায় ভারতবর্ষের আদর্শকে তাঁহারা মুখ্য স্থান দিয়াছেন এ কথা সত্য, কিন্তু শিক্ষার যেটা আসল ভিত্তি—সুস্থ সবল চরিত্র-নির্মাণ সেখানেই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ রহিয়া গিয়াছে। University Commission dogma এবং competitive indoctrination-এর নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এই dogma এবং competitive indoctrination কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ বিভিন্ন রূপে মূর্ত হইয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করিতেছে না? আমরা প্রত্যেকেই আজ এক বা একাধিক ইজ্‌মের কবলে পড়িয়া বা স্কন্ধে চড়িয়া আত্মভ্রষ্ট হইয়াছি। শুধু কমিউনিজ্‌ম্ নয়, গান্ধী-ইজ্‌ম্ও আজ আমাদিগকে কম বিব্রত করিতেছে না। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ কেহ অনুসরণ করেন না, কিন্তু তাঁহার নামে দল পাকাইতে অনেকেই উৎসুক। সত্যশিক্ষার ভিত্তিতে চরিত্রগঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ যে কোনও মহৎ আদর্শকে লোকে dogma ও doctrine-এ পরিণত করিবে। University Commission truly religious man-এর স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—The truly religious man is the enemy of the established order, not its spokesman. He is the man of alien vision. He throws existing things into confusion. He is a revolutionary who is opposed to every kind of stagnation and hardening. He is the advocate of the voice which society seeks to stifle, of the ideal to which the world is deaf.

ভারতবর্ষের ধর্মজগতের ইতিহাসে এরূপ truly religious man-এর বারংবার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়া এরূপ truly religious man সৃষ্টি করা যায় না, প্রত্যেক বালককে বাল্যকাল হইতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-অনুসারে বিকশিত হইবার সুযোগ দিতে হয়। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রে সে সুযোগ আপাততঃ নাই।

ভারতবর্ষের ধর্ম চিরকাল প্রগতিশীল। তাহা কোনও কালে stagnation-কে প্রশ্রয় দেয় নাই। বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড যখন সমস্ত জাতির প্রাণসত্তাকে আবিল করিয়াছিল তখন আমরা পাইয়াছিলাম উপনিষদের ঋষিদের, গৌতম বুদ্ধকে। বৌদ্ধধর্মের যখন অধঃপতন ঘটিল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় যখন "বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া উঠিল" তখন আবির্ভূত হইলেন কুমারিল ভট্ট, তাহার পর শঙ্করাচার্য, তাহার পর রামানুজ। মুসলমানের আমলে আমাদের নৈতিক জীবন যখন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা পাইয়াছিলাম শ্রীচৈতন্যকে। যে কয়জনের নাম করিলাম ইহারা প্রত্যেকেই শৈশবকালে আর্যধর্মের আদর্শ-অনুসারে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে ইংরেজের আমলে জড়বাদের কবলে আবার যখন আমাদের দেশের ধর্ম বিপন্ন, তখন যে সব বিদ্রোহী সমাজসংস্কারকদের আমরা পাই তাঁহারা যদিও বাল্যকাল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অতিবাহিত করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদেরও জীবনের আদর্শ ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই আদর্শ। রাজা রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ইঁহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিকশিত করিয়াছেন।

এই ব্রহ্ম এই সত্য সকল ধর্মেরই মূল। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য, প্রতি ধর্মের ক্ষেত্রে নামটা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর সুধী ও সাধক সমাজ বারংবার সমস্বরে ঘোষণা করিতেছেন

যে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সুখশান্তির আশা নাই। কিন্তু কেবলমাত্র self-effort দ্বারা এই ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, তাহার জন্য সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য self-effort প্রয়োজন, সাধনার ক্ষেত্র পাইলেও সকলে ব্রহ্মজ্ঞানী হয় না, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্র না থাকিলে তাহার সম্ভাবনা পর্যন্ত লোপ পায়। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে সেরূপ ক্ষেত্রের কোনও ব্যবস্থা নাই।

আমি অবশ্য ইহা দাবি করিতেছি না যে আমাদের রাষ্ট্র গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম করিয়া দিন এবং সেখানে ছাত্রেরা দলে দলে গিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করুক। এরূপ ব্যবস্থা করিলে যে রাতারাতি আমরা সকলে ধার্মিক হইয়া উঠিব এ অসম্ভব কল্পনা আমার নাই। কিন্তু এ ক্ষোভ আমার আছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রে ভারতের কোন ছাপ নাই, ভারতীয় রাষ্ট্রও পৃথিবীর অন্যান্য জড়বাদী রাষ্ট্রের অনুকরণমাত্র। আজ যখন পাশ্চাত্ত্য দেশের চিন্তানায়কগণ জড়বাদের ভীষণ ভবিষ্যৎ দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া আশা করিতেছেন যে ভারত-ধর্মই পৃথিবীতে একদিন হয়তো শান্তির পথ প্রদর্শন করিবে তখন ভারত-রাষ্ট্র কিন্তু নকল করিতেছে জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদের, তাহার সমস্ত উৎসাহ ও ঝোঁক গিয়া পড়িয়াছে কেবলমাত্র আধিভৌতিক উন্নতির উপর। পৃথিবীতে শান্তির পথ দেখাইতে হইলে জাতির চরিত্রে যে অধ্যাত্মবোধ জাগরূক করা দরকার সে সম্বন্ধে আমাদের রাষ্ট্র উদাসীন। আজ একমাত্র বিনোবাজীর কর্মে ও বাণীতে ভারতের শাশ্বত আহ্বান শোনা যাইতেছে, কিন্তু তিনি শাসন-পরিষদের কেহ নহেন। তিনিও দেশের আধিভৌতিক দুঃখমোচনের জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার পদ্ধতিতে ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ সুরটি লাগিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর সভ্যসমাজ আজ মুগ্ধ বিস্মিত হইয়াছেন। আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রে সে সুর নাই। পরাধীনতার ফলে আমরা অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি তাহা সত্য, আমাদের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করা যে

সর্বাগ্রে দরকার এ কথাও সত্য, কিন্তু স্বদেশে সেই অন্নবস্ত্র উৎপাদন করিবার জন্য যে চারিত্রশক্তি প্রয়োজন তাহার দিকে মন না দিলে সমস্তই বৃথা হইবে। হইতেছেও। আমাদের রাষ্ট্র আমাদের দুঃখ-মোচনের বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন ; চাষ, জমি, ট্রাক্টার, সার, জল-সেচনের ব্যবস্থা, গরু ছাগল মুরগী মৎস্যের উন্নতি, বড় বড় নদীকে বাঁধিয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদন ; এ সমস্তের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, কিন্তু যে পরিমাণ সুফল আমরা আশা করিয়াছিলাম সে পরিমাণ সুফল হয় নাই। তাহার কারণ যে সুস্থ, সমর্থ চরিত্রবান্ মানুষ সমস্ত কর্মের প্রথম ও প্রধান উপাদান সেরকম মানুষই আমাদের দেশে বেশি নাই। যে ইংরেজী শিক্ষা আমরা স্কুলে কলেজে এতদিন লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে গলদ ছিল, তাহা ধর্মহীন ছিল, ইংরেজেরা আমাদের শক্ত সমর্থ চরিত্রবান্ মানুষ করিতে চান নাই, মেরুদণ্ডহীন কেরানি করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষা-পদ্ধতিতেও সে গলদ বর্তমান। আধিভৌতিক উন্নতির জন্য হয়তো আমাদের বাধ্য হইয়া এই অপটু অসাধু লোকদের লইয়াই কাজ চালাইতে হইবে, কি যদি ভবিষ্যতের জন্য আমরা সাধু সচ্চরিত্র কর্মী-সৃষ্টির আয়োজন না করি আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমাদের সমস্যার সমাধান হইবে না, সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যে আজ আধিভৌতিক জগতে এত উন্নত তাহার কারণ তাহাদের চরিত্র। তাহাদের শিক্ষাবিধিও চরিত্র-নির্মাণকেই প্রাধান্য দিয়াছে। কেবল নোট মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করাই সে দেশের চরম লক্ষ্য নয়। তাহাদের লক্ষ্য জীবনকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিবার শক্তি অর্জন করা। তাঁহাদের দেশের একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ Mr. Whitehead বলিয়াছেন—I lay it down as an educational axiom that in teaching you will come to grief as soon as you forget that your pupils have bodies. তাঁহাদের শিক্ষাটা ভোগমুখী, তাই তাঁহারা আজ

ভোগের শিখরে সমাসীন। প্রাচীনকালে যে ক্ষত্রিয় রাজারা রাজসিকতার আধার ছিলেন তাঁহারাও বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষা লাভ করিতেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাদের চরিত্রে সেই শক্তি সঞ্চার করিত যাহা না থাকিলে ভোগও করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণও যদি আমরা করিতে চাই তাহা হইলেও চরিত্র-নির্মাণ করিতে হইবে। ভোগের শিখরে চড়িয়া আজ পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরা অবশ্য বুঝিতেছেন যে ধর্মহীন ভোগসর্বস্ব শিক্ষার পরিণাম আণবিক বোমা, বহুকাল পূর্বে তাঁহাদেরই কবি Coleridge যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"If a man is not rising upward to be an angel, depend upon it, he is sinking downward to be a devil. He cannot stop at the beast. The most savage of men are not beasts, they are worse, a great deal worse"—সেই বাণীর মর্ম তাঁহারা এখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এখন ভারতবর্ষের বেদে উপনিষদে গীতায় তন্ত্রে angel হইবার সত্যপথ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অর্থাৎ আজ তাঁহারাও বুঝিতেছেন শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র বিষয় নয়, বস্তু নয়, bodies নয়,—ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি।

আমরাও যদি আমাদের ভবিষ্যৎ দেশবাসীদের চরিত্রবান্ কর্মনিষ্ঠ করিতে চাই তাহা হইলে ধর্মকেই শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পূর্বে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে—সত্যই কি আমরা চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করুক? আমাদের সত্যই যদি সে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে তাহা হইলে উপায়ের অভাব হইবে না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এ বাক্য মিথ্যা নহে। ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ হোক ইহা আমরা অন্তরের সহিত কামনা করিয়াছিলাম, ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কোন বাধাই আমাদের নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

আমাদের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস আমাদের ভাবনা-অনুযায়ী সিদ্ধির ইতিহাস। প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে অনুশীলন-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানে নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবকযুবতীরা মৃত্যুবরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। পুলিসের লাঠির সম্মুখে তাহাদের উন্নত শির অবনত হয় নাই, কামানবন্দুক, নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড তাহাদের ভীত করিতে পারে নাই। শুনিয়াছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু রাত্রে ঘরের খালি মেজেতে শুইয়া জেল খাটিবার মহড়া দিতেন। নির্যাতনের জন্য অনেক পূর্ব হইতেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেশের অগণ্য আবালবৃদ্ধবনিতা স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রাণদান করিয়াছে, অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতালাভ না করা পর্যন্ত আমরা নানাভাবে যুদ্ধ করিয়াছি। আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল বলিয়া সে স্বাধীনতা আজ আসিয়াছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা চরিত্রে মনে স্বাস্থ্যে শক্তিতে প্রকৃত ভারতবাসী হোক এ আকাঙ্ক্ষা সত্যই যদি আমাদের মনে জাগে তাহা হইলে তাহাও সফল হইবে।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সত্যধর্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে এখনও জাগে নাই। আমরা যে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছি তাহা নয়, বহুকাল পরাধীনতার ফলে, আমাদের ধর্ম এক বিকৃত তামসিক রূপ ধারণ করিয়াছে। ধর্ম আজকাল আমাদের হেঁসেলে ঢুকিয়াছে, তাবিজে মাদুলিতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা কতকগুলি লোককে অতি সাবধানী ভীতু, কতকগুলি লোককে অতি ভণ্ড ধাপ্পাবাজে পরিণত করিয়াছে, আবার কতকগুলিকে করিয়াছে পলাতক। এই ধর্মের প্রভাবে কোষ্ঠী এবং পাঁজি আমাদের জীবনে কায়েমী আসন দখল করিয়াছে, ইহাদের ব্যঙ্গ করিয়াই শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন লিখিয়াছিলেন—

বুঝেছি আত্মা অবিনশ্বর, বুঝেছি মিথ্যা ছুনিয়া
তাই আমাদের নাই ভয় কানা কৌড়ি
তাই পথ চলি দিনখন দেখে খনার বচন শুনিয়া
সাহেব এড়াই সেলাম করি বা দৌড়ি
কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি
ইহলোকে যারা মজা লুটিবার লুটে নিক
আমরা রহিনু পরকালে হাতপাতি।

আর একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

হারু সন্ন্যাসী বেশ তো—বাঃ
কামনা না যাক কামানো ঘুচেছে
বেড়ে চলে দাড়ি বেশ তোফা
কিছুই না ক'রে বছর ভর খেতে চান
বাণী না খসায়ে জ্ঞানীর আসন পেতে চান
বিনা খরচায় গাঁজাচর্চায় মেতে যান
অহো, নমো তায়,
পলাতক ইনি ছাড়ি সুত-জায়া
ছাড়ি যত মায়ামমতায়।
অহো, নমো তায়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে ও রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকৌতুকে এ জাতীয় ব্যঙ্গ রচনা অনেক আছে। বস্তুতঃ যে ধর্ম মানুষকে নিষ্কাম নির্ভীক শান্ত ও উদার করে সেই ধর্মই তামসিকরূপে আজ অনেককে বিষয়ী কামুক অশান্ত ও নীচ করিয়া তুলিয়াছে। গুরু-করা আজ-কাল শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে একটা ফ্যাশান হইয়া উঠিয়াছে, বিরিঞ্চিবাবা জাতীয় গুরুরও অভাব নাই, কিন্তু ধর্মে প্রকৃত আগ্রহ জাগিলে রাত্রিশেষে সূর্যালোকবৎ যে আনন্দচ্ছটা জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয় সেরকম আনন্দিত জীবন তো বড় একটা দেখিতে পাই না! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি ধর্মও পণ্য, বা সামাজিক সুখসুবিধা

পাইবার যন্ত্রমাত্র। আমি যাহা বলিলাম সর্বক্ষেত্রে তাহা হয়তো সত্য নয়, প্রকৃত সাধু ও সাধক নিশ্চয়ই আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দেশের শাশ্বত ধর্মকে সেবায়, শিক্ষায়, কর্মে, সংস্কৃতিতে রূপদান করিবার জন্য যে সন্ন্যাসীর দল গৃহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার নিদর্শন। ব্যক্তিগতভাবে ইঁহাদের ভিতরের খবর আমি বেশি জানি না, কিন্তু বাহির হইতে যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি তাহাতে ইঁহাদের সম্বন্ধে মনে শ্রদ্ধাই জাগিয়াছে। দেশে প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসী নিশ্চয়ই আছেন, তাহা না হইলে দেশ রসাতলে যাইত।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে সত্যধর্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাতির মনে ব্যাপকভাবে এখনও জাগে নাই। আমরা এখনও আন্তরিক ভাবে কামনা করিতে পারিতেছি না যে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত মানুষ হোক। লেখা পড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই—এ মোহ এখনও আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিদ্যালয়ের আদর্শ আমাদের দেশবাসী তেমন উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন—"দেশের যারা ভাল ছেলে, তারা আমার ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে খুব কম এসেছে। যেসব ছেলের কোথাও কিছু হ'ল না তারাই এসে আমার বিদ্যালয়ে ভিড় বাড়াতে লাগল…"

এইজন্যই ক্রমশঃ তাহা সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত হইল এবং এখন যাহা বিশ্বভারতী নামে পরিচিত তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণমাত্র।

আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শকে বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া যে বনিয়াদী শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের দেশে তেমন সমাদর লাভ করিতেছে না। আমাদের যে রাষ্ট্রে মহাত্মা গান্ধী Father of the

Nation বলিয়া কীর্তিত সেই রাষ্ট্রও বনিয়াদী শিক্ষাকে যথোচিত মর্যাদা দিতেছেন না। মুখ্যতঃ যে চারিটি প্রস্তাবের উপর বনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত তাহা এই—

(১) এই শিক্ষা প্রাথমিক, সর্বজনীন, অবৈতনিক, আবশ্যিক (compulsory) এবং সাতবৎসরব্যাপী হইবে।

(২) শিক্ষার বাহন হইবে কর্ম। সমাজ ও পরিবেশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে।

(৩) এই শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে।

(৪) শিক্ষার ভিত্তি হইবে সত্য ও অহিংসা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মূল শিক্ষাদর্শের সহিত ইহার কোনও তফাৎ নাই। মহাত্মা গান্ধীকে বনিয়াদী শিক্ষায় ধর্মের স্থান কি হইবে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—We have left out the teaching of religions from the Wardha Scheme of education, because we are afraid that religions as they are taught and practised to day lead to conflict rather than unity. But on the other hand, I hold that the truths that are common to all religions can and should be taught to all children.

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। এই আদর্শের কথাই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিকাগো বক্তৃতায় পৃথিবীর সজ্জন-সমাজকে শুনাইয়াছিলেন :—

"As the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so O Lord, different paths which men take through different tendencies, various though they appear crooked or straight, all lead to Thee...."

আমাদের বর্তমান কনষ্টিটিউশনের সহিতও ইহার বিরোধ নাই—কিন্তু তবু বনিয়াদী শিক্ষা দেশবাসীর বা স্বদেশী রাষ্ট্রের আন্তরিক সমর্থন লাভ করে নাই।

শুনিয়াছি যে সব ছাত্রের শহরের স্কুলে আসিয়া পড়িবার সুবিধা বা সামর্থ্য নাই তাহারাই বনিয়াদী বিদ্যালয়ে গিয়া ভরতি হয়, শুনিয়াছি গান্ধীভক্ত মন্ত্রীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ-পরিচালিত স্কুলে গিয়াই ভরতি হইয়াছে, কিংবা ভরতি হইতে চায়। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ছেলেমেয়েদের বনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠাইতে চান না। ভাল শিক্ষকও সেখানে কম আছেন। শুনিয়াছি যে সব শিক্ষকের অন্য কোথাও ভাল চাকরি জোটে না তাঁহারাই অগত্যা গিয়া এইসব বনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

অর্থাৎ দেশের লোকদের এ বিষয়ে সত্য আগ্রহ জাগে নাই। যদি জাগিত তাহা হইলে রাষ্ট্রের সাহায্যভিক্ষা করারও প্রয়োজন আমরা অনুভব করিতাম না। গৃহেই আমরা এ ব্যবস্থা করিতাম। আমরা আমাদের ছেলেদের বিলাসী, অকর্মণ্য, পরনির্ভরশীল করিয়া ফেলিয়াছি কারণ আমরা নিজেরাই বিলাসী, অকর্মণ্য, পরনির্ভরশীল। ছেলেদের সেই আদর্শে গড়িতে চাই, বুঝি না যে ইহাতে কি সর্বনাশ হইতেছে। পূর্বে আমাদের দেশে স্কুলকলেজ ছিল না, কিন্তু সেজন্য জ্ঞানের ধারা অবরুদ্ধ হইয়া যায় নাই, শিক্ষকেরা নিজ নিজ গৃহেই ছাত্রদের গ্রহণ করিতেন। ছাত্রেরা তাঁহাদের গৃহে গিয়া তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইতেন। আমরা ইচ্ছা করিলে এ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। এ ব্যবস্থায় আর কিছু না হউক আর্থিক সুবিধা যে হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ সেকালে যাহার যেমন সামর্থ্য সে তেমনই গুরুদক্ষিণা দিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিত, এ বিষয়ে বাঁধা-ধরা কোন কড়া নিয়ম ছিল না। একালের শিক্ষকরাও এ ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই রাজি হইবেন যদি তাঁহারা ছাত্রের মধ্যে প্রকৃত জিজ্ঞাসু এবং ভক্ত সেবককে দেখিতে পান। কিন্তু তাহাই

তাঁহারা পাইবেন না। একালে ছাত্রের পিতামাতারা ছেলেদের গুরু-গৃহে ভৃত্যের মতো কাজ করিতে দিতে সম্মত হইবেন কি ? সেকালে গুরুদক্ষিণা সম্বন্ধে বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল না বটে, কিন্তু এ নিয়মটা আবশ্যিক ছিল—শিষ্যকে গুরু-গৃহে গৃহকর্ম করিতে হইবে। ব্যক্তিগত-ভাবে কায়েন মনসা বাচা গুরুকে সেবা করা প্রত্যেক ছাত্রের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল। অধ্যাপক আল্‌টেকার মনু হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ছাত্র গুরুকে সেবা করিবে অগ্নির মতো, দেবতার মতো, রাজার মতো, পিতার মতো, ভর্তার মতো। তিনি দেখাইয়াছেন যে বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দু গুরুকুলে—"The student was expected to do personal service to the teacher like a son, suppliant or slave. He was to give him water and toothstick, carry his seat and supply him bath-water. If necessary he was to cleanse his utensils and wash his clothes. He was further to do all sundry work in his monastery or his teacher's house like cleansing the rooms, bringing fuel, etc....Tradition asserts that even great personages like Srikrishna had deemed it an honour to do all kind of menial work in their preceptor's house during their student days.

অভিজাত মুসলমান সমাজেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আলমগীরের পুত্র মহম্মদ নিজহস্তে তাঁহার গুরুর কর্দমাক্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া দেন নাই বলিয়া আলমগীর বিরক্ত হইয়াছিলেন শুনিতে পাই।

যে Dignity of Labour লইয়া আজকাল আমরা মুখে আস্ফালন করি কিন্তু যাহার আভাস পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নাই, তাহারই পরিপূর্ণ রূপ কর্মযোগ। সেকালে গুরু-গৃহে এই কর্মযোগেরই ভিত্তি স্থাপিত হইত। অনেকে হয় তো বলিবেন, "মশায়, সবই তো বুঝলাম কিন্তু সেরকম গুরু কোথায় ?"

এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে ১৩১৩ সালে তাঁহার 'শিক্ষাসমস্যা' নামক প্রবন্ধে দিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—"শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গুরু তো ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে আমাদের সংগতি যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্য যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়, আবার স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়, একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়-মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মস্তিষ্ক জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়-মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়েও কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপক্ষ হইতে যথার্থ-ভাবে দাবি উত্থাপিত না হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে···"

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অন্তর হইতে এ প্রার্থনা এখনও

উত্থিত হয় নাই। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাই নাই, গান্ধীজীর বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধেও তেমন উৎসাহী নহি। তাহার কারণ শিক্ষাকে এখনও আমরা অর্থের মানদণ্ডেই বিচার করিতে উৎসুক, সত্য-শিক্ষার মানদণ্ডে নয়। আমরা এ কথা এখনও অন্তর দিয়া উপলব্ধি করি নাই যে অর্থ উপার্জন করিতে হইলেও ডিগ্রি অপেক্ষা সত্যের ভিত্তিতে নির্মিত চরিত্রই বেশি কার্যকরী। আমাদের এই বোধ জাগরিত না হইলে রাষ্ট্রের বা সমাজের মঙ্গল নাই। আমাদের আপাত-উন্নতির বুদ্বুদ সামান্যতম আঘাতেই ফাটিয়া যাইবে। ধর্মহীন শিক্ষা আমাদের দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে, অন্নবস্ত্রের জন্যও তাই আমরা পরমুখাপেক্ষী। শক্তির একমাত্র উৎস যে সত্য-শিব-সুন্দর তাহার প্রতি আগ্রহবান্ না হইলে আধিভৌতিক সুখসুবিধাও আমরা লাভ করিতে পারিব না। পিতামাতাদের মনে যদি এ আগ্রহ জাগে তবেই আমরা ধর্মকে—সত্য-মানবধর্মকে—শিক্ষার ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভারতবাসী নামের যোগ্যতা দান করিতে পারিব।

এ আগ্রহ জাগাইবার কোনও উপায় আছে কি ? একটি উপায় আছে। কিন্তু সে উপায়ের পথও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সে উপায় সাহিত্য। সৎসাহিত্য মানুষকে তাহার অজ্ঞাতসারেই সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে, মহৎমানবত্বের দিকে আকর্ষণ করে। আমাদের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ ইচ্ছা করিলে ব্যাপকভাবে সৎসাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাহিত্যের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করিয়া বা সাহিত্যকে উৎসাহ দিবার নামে নিজেদের পেটোয়া লোকেদের কিছু বকশিশ বা মেডেল দিলে তাহা সম্পন্ন হইবে না। আন্তরিকভাবে সেজন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের আহ্বান করিয়া যাহাতে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সহজে সুলভমূল্যে কথকতা, অভিনয়, সিনেমা, লাইব্রেরি প্রভৃতির মাধ্যমে সৎসাহিত্য প্রচারিত হয়, জনসাধারণের অন্তরে যাহাতে তাহা প্রবেশ

করে এ ব্যবস্থা করিতে হইবে। করা কিছু অসম্ভব নয়। ইউনিভার্সিটি কমিশনও ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যে ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য করিতে বলিয়াছেন তাহা ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশের জন্য করা কি অসম্ভব? দেশের উন্নতির জন্য ছাগ-পরিদর্শক, মুরগী-পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছে, দেশের প্রকৃত উন্নতি যে সাহিত্যের মাধ্যমে হয় সে সাহিত্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করিলে তাহা কি খুব অন্যায় দাবি হইবে?

প্রশ্ন উঠিবে সাহিত্য বলিতে কি বোঝায়? যাহাই ছাপার অক্ষরে বাজারে বাহির হয় তাহাই আজকাল সাহিত্য-পদবাচ্য। কিন্তু মানুষের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবিত করে সৃষ্টিধর্মী কাব্য-সাহিত্য। পুরাকালে তপোবন সমাজের যে স্থান অধিকার করিয়া ছিল বর্তমান যুগে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যও ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এখন সৎসাহিত্যের উপবনেই আমরা সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাই।

আধুনিক জগৎ যখন বস্তুবাদের স্থূল চাপে ম্রিয়মাণ হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে তখন আমরা বিবেকানন্দের সাহিত্য হইতে আশ্বাস পাই—Man has never lost his empire. The soul has never been bound. Believe that you are free and you will be free.

রমা রলঁ্যা তখন উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—উত্তিষ্ঠত! চিত্তকে সকল আপস, সকল হীন মৈত্রীবন্ধন, সকল ছদ্মবেশী দাসত্ব হইতে মুক্ত কর। চিত্ত কাহারও দাস হইতে পারে না। আমরাই চিত্তের দাস। আমাদের আর কোন প্রভু নাই। এই স্বাধীন চিত্তের আলো বহন করা, তাহাকে রক্ষা করা এবং পথভ্রান্ত মানুষকে ইহার আশ্রয়-ছায়ায় ডাকিয়া আনাই আমাদের কাজ—

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আমাদের দেখাইয়া দেন—মা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, কি হইবেন। তিনিই বলিয়া দেন মাতৃপূজায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ধন নয়, ঐশ্বর্য নয়, এমন কি প্রাণও নয়, ভক্তি।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে' কেমন করে' সইব
বাতাস আলো গেল মরে' একী রে দুর্দৈব
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে—
গান আছে যার উঠ না গেয়ে—
চলবি যারা চল রে ধেয়ে—
আয় না রে নিঃশঙ্ক
ধূলায় পড়ে' রইল চেয়ে ঐ যে অভয় শঙ্খ।

বস্তুতঃ, সৎসাহিত্যই এই যুগে অশান্ত হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। এই আণবিক বোমা-ভীত, ইজ্‌ম-কণ্টকিত স্বার্থপরতার যুগও কবির বাণীকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই। আজও আমরা সাগ্রহে বিশ্বাস করিতে চাই সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আর্ত অসহায় মানব আজও উৎকর্ণ হইয়া প্রাচীন কবিঋষির উচ্ছ্বসিত বাণী শুনিতেছে—হে অমৃতের পুত্রগণ তোমরা শ্রবণ কর, তমসার পরপারে আমি আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি।

সাহিত্যই আমাদের একমাত্র পথ, একমাত্র পথপ্রদর্শক। আধুনিক ভারতের নব-জাগরণের মূলে ছিল এই সাহিত্য। রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের এবং আরও অনেকের সাহিত্যসাধনাই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। মহত্তর সংগ্রামে আমাদের যদি আবার অবতীর্ণ হইতে হয় এই সাহিত্যই আমাদের প্রেরণা জোগাইবে। জড়বাদের কোলাহলে পৃথিবী আজ পরিপূর্ণ, কিন্তু সে কোলাহলের উর্ধ্বে এখনও উৎকৃষ্ট কাব্য বর্তমান এবং তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের চিরন্তন মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কি করিয়া রাখিয়াছে তাহার রহস্য ব্রহ্মের রহস্যের মতোই অতি জটিল অথচ অতি সহজ। যাঁহারা জড়বাদ-লব্ধ ধোঁয়াটে বুদ্ধি দিয়া ইহা বিশ্লেষণ করিতে যান তাঁহারা জটিলতার সৃষ্টি করেন মাত্র, যাঁহাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ অন্তর রসগ্রাহী তাঁহারা সহজেই ইহার মর্মে

প্রবেশ করেন। উৎকৃষ্ট সৃষ্টিধর্মী কাব্য সূর্যের মতোই স্বয়ম্প্রভ, স্বয়ম্প্রকাশ। তাহা তর্ক করে না, সুপারিশ সংগ্রহ করে না, একেবারে মর্মে গিয়া প্রবেশ করে, সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করিয়া দেয়।

এ কথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে যাঁহারা উচ্চকোটীর বিজ্ঞানী তাঁহারাও সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানী। তাঁহারা সে সন্ধান ভিন্নপথে করেন। কবিদের উপলব্ধি ও ইঁহাদের উপলব্ধিতে বিশেষ তফাত নাই। ইঁহাদের মনে হয় তিলের মধ্যে তৈলের মতো, দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের মতো, ভূগর্ভস্থ নদীর মধ্যে জলের মতো, কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে অগ্নির মতো ক্ষুদ্র সত্যের অন্তরালে বৃহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। এই হিসাবে উচ্চকোটীর বিজ্ঞানীরাও সত্যসন্ধী, সত্যদ্রষ্টা কবি। আইনষ্টাইন তাই মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত, সুলিভান তাই *Limitations of Science* লিখিয়াছেন, Julian Huxley তাই ভগবানের স্বরূপ-সন্ধানে ব্যস্ত, James Jeans তাই সৃষ্টির বিস্ময়ে আপ্লুত, অলিভার লজ তাই পরলোকের রহস্যে নিমগ্ন, H. G. Wells তাই বিজ্ঞানকে কাব্যে এবং কাব্যকে বিজ্ঞানে রূপ দিয়াছেন, জগদীশচন্দ্র তাই 'অব্যক্ত' নামক অনুপম গ্রন্থের গ্রন্থকার। বস্তুতঃ যেখানেই প্রতিভা সৃষ্টিধর্মী সেখানেই তাহার ধর্ম এক—সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাই তাই সমাজকে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবান্বিত করে। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাবানদের দায়িত্বও তাই অনেক বেশি।

কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এ যুগের সৃষ্টিধর্মী কবি বা বিজ্ঞানীরা সকলে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নহেন। পূর্বেই বলিয়াছি এ যুগে সৎসাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। যে যন্ত্রসভ্যতা মানবের শাশ্বত সভ্যতাকে আজ গ্রাস করিতে উদ্যত তাহাই ইহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। যন্ত্রসভ্যতা অনেক প্রথমশ্রেণীর সাহিত্য-স্রষ্টাকেও আত্মভ্রষ্ট করিয়াছে। তাঁহারা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির দিকে তত মনোযোগী নহেন যত মনোযোগী best seller রচনার দিকে। Best seller যে ভাল বই হইতে পারে না তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু

সাধারণতঃ best seller সেই সব পুস্তকই হয় যাহা অধিকাংশ লোকের সাময়িক উত্তেজনাকে তৃপ্ত করে, শাশ্বত সত্যের খবর যাহাতে বড় একটা পাওয়া যায় না। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করিয়া এখন আমাদের দেশের কোনও শক্তিশালী লেখক যদি কাব্য রচনা করেন তাহা হু হু করিয়া বিক্রয় হইবে। পৃথিবীর যে কোনও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করা সহজ, কারণ সাধারণ মানবের সুখশান্তির দিক হইতে বিচার করিলে কোন রাষ্ট্রই এখনও পর্যন্ত নিখুঁত হইতে পারে নাই। G. B. S. এরূপ অনেক রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। Swiftএর গালিভার্স ট্রাভল্‌স্‌ও ব্যঙ্গ-রচনা। ব্যঙ্গ-রচনা বা যে কোনও রচনা সৃষ্টি হিসাবে তখনই সার্থক হয় যখন তাহা শাশ্বত রসবোধকে তৃপ্ত করে, যখন তাহাতে সত্য শিব ও সুন্দর মূর্ত হয়।

আজকাল বাস্তববাদী এই ছাপ লইয়া যে সব সাহিত্য বাজারে বাহির হয় তাহাতে দেখি সত্যের সহিত শিব ও সুন্দরের যোগ নাই। সমাজের কতকগুলি কুৎসিত চিত্র বা মানবের কতকগুলি কুৎসিত প্রবৃত্তিই সে সব লেখার প্রধান উপাদান। তাহা সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু শিব ও সুন্দরের সহিত বিচ্ছিন্ন যে সত্য তাহা পূর্ণ সত্য নহে। যেমন ধরুন, *Lady Chatterle'ys Lover* নামক বিখ্যাত পুস্তকে যাহা চিত্রিত হইয়াছে তাহা আংশিক সত্য। কাম মানুষের একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই যে মানবের একমাত্র ক্ষুধা নহে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মানুষের ক্ষুধা একরূপ নহে—সহস্ররূপ। এই সহস্ররূপী ক্ষুধা কেবল কাম বা লোভের পথে নহে, নানাপথে যে সুধা সন্ধান করিতেছে তাহার পরিচয় যদি কাব্যে না পাইলাম তবে কাব্যের সার্থকতা কি? কামের কবলে তো সকলেই আমরা অল্পবিস্তর পড়িয়া আছি, কেবল তাহারই স্বরূপ জানিবার জন্য কাব্য পড়িবার প্রয়োজন নাই। আর একটা উদাহরণও মনে পড়িতেছে—মমের Rains নামক বিখ্যাত গল্পটি। এ গল্পের মূল কথাটি এই যে একজন মিশনারি একটি পতিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই

শেষে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। এ রকম ঘটনা প্রায়ই সমাজে ঘটে, ইহারই পুনরাবৃত্তি, এমন কি শিল্পায়িত পুনরাবৃত্তিও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি নহে, কারণ ইহাতে শিব ও সুন্দরের রূপ নাই। ঠিক এই একই উপাদান লইয়া আনাতোল ফ্রাঁস্ 'থেয়া' (*Thais*) লিখিয়াছেন এবং তাহা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ তাহাতে পূর্ণ সত্য বিচিত্ররূপে রূপায়িত হইয়াছে। রমা রলঁ্যার 'জাঁ ক্রিস্তফ্' গ্রন্থের প্রথমভাগেও কামনার চিত্র আছে, কিন্তু কেবলমাত্র ঐ চিত্রটি আঁকিয়াই গ্রন্থকার তাঁহার কাব্য শেষ করেন নাই। নানা সুখদুঃখের মধ্য দিয়া তিনি নায়কের চিত্তকে বৃহতের দিকে বিরাটের দিকে উন্মুখ করিয়াছেন, সত্যের সহিত শিব ও সুন্দরের শিল্প-সঙ্গত মিলন ঘটাইয়াছেন, তাই জাঁ ক্রিস্তফ্ আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে অমর কাব্য। ঠিক ওই কারণেই মমের *Of Human Bondage* সার্থক সৃষ্টি। আমাদের দেশে বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন অনেক চিত্র আছে যাহা আধুনিক শ্লীলতার মানদণ্ডে অশ্লীল। কিন্তু কাম-লীলাই যে বৈষ্ণব-কাব্যের একমাত্র বক্তব্য নহে তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব-কাব্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর মনে যে সুর বাজিতে থাকে তাহা কামের সুর নয়, প্রেমের সুর, ভক্তির সুর, অনন্তের সুর।

কবির সৃষ্টিতে বাস্তব অবাস্তব গৌণ ব্যাপার। সার্থক সৃষ্টিতে ফুল অভিমান করে, পাখী উপদেশ দেয়, পশুরাও মানুষের ভাষা ব্যবহার করে, ঘড়ার ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হয়, রাবণের দশ মুণ্ড থাকে, রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শে জাগেন, রূপার কাঠির স্পর্শে ঘুমান। শাশ্বত রস যেখানে জমিয়াছে সেখানে কিছুই বেমানান মনে হয় না। বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াও যে সার্থক সৃষ্টি হইবে তাহা কেবল বাস্তব হইবে না, তাহা সৃষ্টিও হওয়া চাই। বাস্তবকে কবি ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন চিত্রকর যে ভাবে তাঁহার চিত্র-পট ব্যবহার করেন। তাহা কাগজ, কাপড়, কাঠ, পাথর, লোহা, সোনা, তামা, পিতল, কাচ, যে কোনও জিনিস হইতে পারে, কিন্তু সেই জিনিসটার আস্ফালনই

চিত্র হইবে না। চিত্রকরকে তাহার উপর ছবি আঁকিতে হইবে। সে ছবিতে কেবল অনন্যতা বা প্রতিভার রূপ থাকিলেই তাহা প্রথম শ্রেণীর শিল্প-সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে না তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে মনকে যদি উন্মুখ না করে। বাস্তবের পটভূমিকায় কবিও যাহা সৃষ্টি করিবেন তাহা এই জাতীয় সৃষ্টি, তাহা বাস্তবের নকলমাত্র নয়। কবি চিত্রকর, ফোটোগ্রাফার বা সাংবাদিক নহেন। প্রথমশ্রেণীর কবিরা যে কোনও পটভূমিকার উপরই সত্য-শিব-সুন্দরের সম্পূর্ণ সত্যের বাণীকে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারেন। তাই শাশ্বত সাহিত্যের বাণীও উপনিষদের বাণীর মতো ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ। তাই শাশ্বত সাহিত্যই শাশ্বত ধর্মের বাহক। যে সব সাহিত্যিক বাস্তবতার অজুহাতে সমাজের মধ্যে যাহা কুৎসিত, যাহা অক্ষম, যাহা পঙ্গু, যাহা কর্দমাক্ত, যাহা কলঙ্কিত তাহাই বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করেন তাঁহারা জীবনের পূর্ণসত্যকে প্রকাশ করেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান আলোকে ফুটাইবার জন্য কালো পটভূমিকা প্রয়োজন, আলো যদি না ফোটে কালো পটভূমিকা অর্থহীন। সমাজে কুৎসিত চিত্র অনেক আছে, তাহারা সাহিত্যের বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া কেহ যদি সেইগুলিকে কাব্যে স্থান দিয়া উগ্রবর্ণে কেবল সেইগুলিকে চিত্রিত করিতে থাকেন তখন সন্দেহ হয় লেখকের শিল্প-প্রচেষ্টার পিছনে অন্য মতলব আছে, সম্ভবতঃ তিনি সাহিত্যিক-বেশী মিস মেয়ো, ভাল কিছু তাঁহার চোখে পড়ে না, কেবল ড্রেনগুলিই তিনি দেখিতে পান।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি বর্তমান যুগের যন্ত্রপতিরাই বর্তমান যুগের প্রভু। তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে তো বটেই, শাশ্বত সত্যকেও ছাঁচে ঢালিয়া নিজেদের সুবিধামতো standardise করিতে চান। অনেক সাহিত্যিক ক্ষণস্থায়ী খ্যাতির মোহে অর্থের লোভে অথবা কোন মিথ্যা আদর্শে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হস্তে ক্রীড়নক মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য তাই

অনেকস্থলে আজ হীন প্রোপ্যাগাণ্ডা মাত্র। অনেক বিজ্ঞানীরও ঠিক এই দশা। বিজ্ঞানের আবিষ্কার তাই আজ মানবসমাজের হিতকর না হইয়া অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। যাহা সঞ্জীবনী সুধা হইতে পারিত তাহা বিষে পরিণত হইয়াছে। পুরাণের গল্পে শুনিয়াছি দৈত্যদানবদের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া সৃষ্টিকর্তারা তাহাদের বর দিতেন এবং সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া দানবেরা মানবসমাজকে পীড়ন করিত। বর্তমান যুগের যাঁহারা স্রষ্টা তাঁহারাও অনেক আজ দৈত্যদানবদেরই বরদান করিয়াছেন।

একটি মাত্র আশার কথা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত সাধক পৃথিবীর সর্বত্র এখনও কিছু কিছু আছেন। পৃথিবী যখন জলপ্লাবিত হইয়াছিল তখন নোয়া তাঁহার নৌকায় ভাল ভাল জিনিসের নমুনাগুলি তুলিয়া লইয়া সৃষ্টিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোনও অজ্ঞাত নোয়া হয়তো এই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের রক্ষা করিয়া মানবজাতিকে একদিন মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আমাদের ধর্মশিক্ষা দিতে অপারগ, নানা কারণে সে সামর্থ্য তাহার নাই। অথচ ইহাও সুনিশ্চিত যে একমাত্র সত্যধর্মই আমাদিগকে প্রকৃত সুখশান্তির সন্ধান দিতে পারে, আত্ম-ভ্রষ্টকে আত্মস্থ করিতে পারে, পরাধীন মনুষ্যত্বকে স্বাধীনতার আলোকে বিকশিত করিতে পারে। পৃথিবীর প্রতিদেশেই আজ সাধুরা লাঞ্ছিত, মনুষ্যত্বের কণ্ঠরোধ করিয়া দিবার জন্য নানা মুখোশ পরিয়া যন্ত্রশক্তি আজ উদ্যত। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবিরাই এখন মানবজাতির আশা। তাঁহারাই আজ মানবজাতির সেই বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন যে বিবেক অবিচলিতকণ্ঠে বলিবে 'যন্ত্র বড় নয়, মানুষ বড়। মানুষ যন্ত্রের দাস নয়, যন্ত্রই মানুষের দাস।' শুদ্ধচিত্ত নির্ভীক বিজ্ঞানীদের আজ বলিবার সময় আসিয়াছে—মাদাম কুরীর প্রতিভাশালী কন্যা যেমন এক সভায় বলিয়াছিলেন—বিজ্ঞানের শক্তিকে আমরা

বণিকদের হস্তে তুলিয়া দিব না, মানবের কল্যাণে নিয়োগ করিব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যন্ত্রসভ্যতা আমাদের মনুষ্যত্বকে যে নূতন কারাগারে বন্দী করিয়াছে সেই কারাগারের মধ্যেই নূতন যুগের শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হইয়া ধর্ম সংস্থাপন করিবেন যদি আধুনিক যুগের সত্যদ্রষ্টা কবি ও বিজ্ঞানীরা তাঁহাকে তেমন করিয়া আহ্বান করিতে পারেন। বর্তমান যুগের নিপীড়িত মানব সত্যদ্রষ্টাদের কণ্ঠে সেই উদাত্ত আহ্বানবাণী শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে।

বাঙালীর বৈশিষ্ট্য *

সমাগত ভদ্রমহিলাগণ ও সুধিবৃন্দ,

আজ আপনাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এই আনন্দের সহিত বিষাদও মিশ্রিত আছে ! বাঙলা-সাহিত্যের তিনজন কৃতী সাধকের তিরোধানে বাঙলা-সাহিত্য-সংসার আজ ম্রিয়মাণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একজন দিক্‌পাল ছিলেন। তাঁহাদের অকালমৃত্যু শুধু বাঙলা-সাহিত্যেরই নয়, ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেরই ক্ষতিজনক। তাঁহাদের উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

তাহার পর প্রণাম নিবেদন করিতেছি এই কলিঙ্গভূমিকে, যাহার সহিত বঙ্গের নাম ইতিহাসে, গল্পে, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, দৈনন্দিন জীবনের স্মৃতিসংস্কারে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, প্রণাম নিবেদন করিতেছি সেই সব কৃতী কলিঙ্গ-কবিদের যাঁহাদের প্রাদেশিকতা-বর্জিত উদার সাহিত্য-সাধনা বঙ্গের মনীষাকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

একসঙ্গে এতগুলি শ্রদ্ধেয় গুণীর সান্নিধ্য লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। বর্তমান সময়ে এরূপ সম্মেলনের প্রয়োজনও আছে। আজ সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে আপনাদের নিকট যাহা নিবেদন করিব তাহা রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গসাহিত্যের বিস্তারিত সমালোচনা নয়, রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গসাহিত্যের নানা বিভাগে গর্ব করিবার মতো অনেক কৃতিত্ব সঞ্চিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা লইয়া আস্ফালন অথবা বাগাড়ম্বর আমি করিব না। জাতি হিসাবে আমরা আজ বিপন্ন, যে জীবন সাহিত্যের উৎস আমাদের

* নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন, অষ্টবিংশতিতম অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ। অধিবেশন কটকে হইয়াছিল।

সেই জীবনই আজ দুর্দশাগ্রস্ত, আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ করিয়া এ নিদারুণ সত্যকে চাপা দিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে পৃথিবীর সকল জাতির জীবনে দুঃখ যেমন নানা মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল, আমাদের জীবনেও তেমনি তাহা দেখা দিয়াছে। সেই দুঃখের ভারে আজ আমরা নিষ্পিষ্ট, সেই দুঃখের করাল কবল হইতে মুক্তি পাইবার শক্তি আমাদের আছে কি না এবং আজ আমরা যে স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গ সেই রাষ্ট্রের কোনও কর্তব্য আমাদের প্রতি আছে কি না—এই অভিভাষণে তাহাই আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। আমরা যদি এ বিপদ উত্তীর্ণ হইতে না পারি, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আমি রাজনৈতিক নহি, আমি সাহিত্যিক। আমি সেই সরস্বতীর উপাসক, যিনি তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তি, যিনি কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা, সকল বর্ণের সমসম্মিলনে যে শ্বেতবর্ণের উদ্ভব তাহাই সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়া যিনি সর্ব-শুক্লা, সর্বসুরের শোভন সমন্বয়ে যে সঙ্গীত তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে যিনি বীণাবরদণ্ড-মণ্ডিতভুজা, সর্বজ্ঞানের প্রতীক পুস্তকমালা বাম অঙ্কে ধারণ করিয়া যিনি পুস্তকধারিণী, যাঁহার পদ্মাসন একদল নহে—শতদল, যাঁহার বাহন আকাশচারী মানসসরোবরবাসী, যিনি ভগবতী, নিঃশেষজাড্যাপহা, যিনি ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতির্দেবৈঃ বন্দিতা, সত্যশিবসুন্দরের এই চিরন্তন প্রকাশ-প্রতিমার উপাসনা করিয়া আসিয়াছি বলিয়া আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি যে, আমাদের জীবনে অসত্য অশিব এবং অসুন্দরের ছায়াপাত হইয়াছে। সে ছায়া প্রতিদিন ঘনতর হইতেছে। আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার বিচার করিয়া অবিলম্বে আমরা যদি এ বিষয়ে অবহিত না হই, আমাদের সাধনা, সংস্কৃতির জগতে আমাদের কৌলীন্য অবলুপ্ত হইয়া যাইবে।

রাজনীতিই যাঁহাদের উপজীব্য, তাঁহারা বহু দলে বিভক্ত হইয়া রাজনৈতিক কৌশলে এ সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইতেছেন।

তাঁহাদের সে প্রয়াস কতটা আন্তরিক, কতটা মৌখিক, কতটা দাবার চাল, কতটা কার্যকরী, কতটা বিপক্ষকে হীন করিবার কৌশল, তাহা আমি জানি না। তাহার আলোচনা করিয়া অনধিকার-চর্চাও আমি করিব না। আমি যাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি তাহাই আজ অকপটে ব্যক্ত করিব।

বাঙালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতিশয় আত্মসচেতন জাতি এই বাঙালী। ইতিহাসের পাতা উলটাইলেই প্রতীয়মান হয় যে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা, নিজের স্বাধীন সত্তাকেই কেন্দ্র করিয়া শৌর্যে-বীর্যে-মহিমায়, রূপে-রসে-রঙে-প্রস্ফুটিত হইবার আগ্রহ বহু প্রাচীন কাল হইতেই তাহার অন্তরে বদ্ধমূল। এই বৈশিষ্ট্যটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুগে যুগে সে প্রাণপাত করিয়াছে, গৌরবের তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করিয়াছে, গ্লানির কর্দমেও অবলিপ্ত হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য তাহাকে উন্নতির আলোকেও যেমন লইয়া গিয়াছে, অবনতির অন্ধকারেও তেমনি টানিয়া আনিয়াছে।

নৃতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকদের মতে দ্রবিড়, আদি-অস্ট্রেলীয়, নিগ্রোবটু ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে আমাদের উৎপত্তি। অস্ট্রিক জাতিরই উত্তরাধিকার আমরা ভোগ করিতেছি আমাদের কৃষিকর্মে। আমাদের ধান, কলা, নারিকেল, পান প্রভৃতিও নাকি তাহাদেরই দান। আমাদের উদ্ভবের এই বৈচিত্র্যই হয়তো আমাদের শিল্পীও করিয়াছে। বস্তুতঃ চিন্তা করিলেই এই কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আহারে-বিহারে, সমাজ-ব্যবস্থায়, রীতিনীতিতে, তৈজসপত্রে, গৃহনির্মাণে, ধর্মে, প্রথায় আমাদের যে প্রতিভা ব্যক্ত তাহা শিল্প-প্রতিভা। যুগ যুগ ধরিয়া তাই আমরা শিল্পিজনসুলভ স্বতন্ত্রতার পক্ষপাতী, অনন্যতার সাধক, সেই জন্যই আমরা গুণগ্রাহী, সেই জন্যই আমরা কথায় কথায় বিদ্রোহ করি, দলে দলে শহীদ হইয়া ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া পড়ি।

ইতিহাসের পটভূমিকায় আলোচনা করিলে কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, প্রাচীন আর্য ঋষিগণ বাঙালীদের উপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে তদানীন্তন বঙ্গবাসী সম্বন্ধে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা প্রশংসাসূচক নহে। দস্যু, পক্ষী, ম্লেচ্ছ, পাপ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁহারা আমাদের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে একটি কথাই সূচিত হয় যে, তাঁহারা তদানীন্তন বঙ্গবাসীদের সুনজরে দেখিতেন না। কোনও বিজেতাই দুর্নমনীয় শত্রুকে সুনজরে দেখেন না। মুসলমানরা আমাদের কাফের বলিতেন, ইংরেজরা বলিতেন—Black niggers.

আর্য-উপনিবেশের প্রত্যন্ত-প্রদেশে যে সকল জাতি তখন বাস করিতেন যদিও তাঁহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত, কিন্তু তাঁহাদের ধরণ-ধারণ, আচার-আচরণ, চিন্তাপ্রণালী একই প্রকার ছিল। পৌরাণিক গল্পে ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচ পুত্রের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। বৈজ্ঞানিকদের মতেও প্রত্যন্তবাসী এই সমস্ত জনগণ একই গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম নানা বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। বিজয়ী বৈদিক আর্যসভ্যতার প্রতি বিরূপতায় ইহারা সকলেই একদলভুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী পরবর্তী যুগে যদিও ভাবপ্রবণ বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু অসিধারী শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রত্যন্তবাসী অঙ্গ বঙ্গ যে সম্মিলিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত মহাভারতে বর্তমান। পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত সন্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন।

ইহা তদানীন্তন বাঙালী মনের স্বকীয়তার পরিচায়ক। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হইতে ইহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, আর্য-সভ্যতাকে বাঙালী চিরকাল বর্জন করিয়া থাকিতে পারে নাই। অবশেষে তাহাকে সে গ্রহণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ ইহার যে সামরিক ও সামাজিক কারণ অনুমান করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঙালীর গুণগ্রাহিতা, অভিনবত্বের প্রতি

বাঙালীর স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং নূতন কিছুকে অনুকরণ করিবার স্পৃহাও বঙ্গদেশে আর্য-সভ্যতার পথ কম সুগম করে নাই। আর্য-প্রতিভার বলিষ্ঠতা, বৈদিক যজ্ঞের আড়ম্বর বাঙালীর শিল্পীমানসকে অভিভূত করিয়াছিল, পিঙ্গলকেশ নীলচক্ষু তপ্তকাঞ্চনবর্ণ আর্যদের দেখিয়া বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই তাহাদের বরণ করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করে নাই। যাহা নূতন তাহা যদি মনোহর হয়, তাহাতে যদি উচ্চ আদর্শের অথবা বিরাট কল্পনার খোরাক থাকে, বাঙালী তাহাকে সাগ্রহে বরণ করে। নূতন কিছুর প্রতি বাঙালীর এই আগ্রহ লক্ষণীয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যদিও ব্যঙ্গের সুরে একদিন গাহিয়াছিলেন, "নূতন কিছু কর, একটা নূতন কিছু কর"—কিন্তু নূতন কিছু করিবার বাসনাই বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। সম্পূর্ণ নূতনকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব করিবার ক্ষমতাও বাঙালী-চরিত্রে আছে।

আর্য-সভ্যতা বঙ্গদেশে আসিল, কিন্তু বেশিদিন টিঁকিল না। বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্মের মধ্যে বৈষম্যের বীজ নিহিত ছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সে সভ্যতার শিরোমণি, একমাত্র দ্বিজ ক্ষত্রিয়ই সে সভ্যতায় শক্তির প্রতীক এবং দ্বিজ বৈশ্যই বাণিজ্য-সম্রাট, বাকি সকলে শূদ্র—দাস। ভেদনীতি-পূর্ণ এই আর্য-আভিজাত্য বাঙালী সহ্য করিল না। তাই যখন মগধে ইহার প্রবল প্রতিবাদ বাঙ্‌ময় হইল, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের নবধর্মপ্রচারে এবং কপিলবাস্তুর রাজবংশে আর্য-সভ্যতাপুষ্ট ক্ষত্রিয় রাজপুত্র সিদ্ধার্থের উদাত্তকণ্ঠে, তখন বাঙালী জনসাধারণ—আর্যসভ্যতা বরণ করিবার পূর্বে যাহারা পঞ্চায়েত-চালিত গণতন্ত্রে অভ্যস্ত ছিল তাহারা—এই সাম্যের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইল। বৈদিক সভ্যতায় যাহারা শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছিল, তাহারা দলে দলে বৌদ্ধ হইতে লাগিল। সাম্য ও প্রেম—এই দুইটিই তো বাঙালীর প্রাণের কথা। যুগ যুগ ধরিয়া ইহার জন্যই সে তৃষিত। ইহারই অন্বেষণে বহু আলেয়া, বহু মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া সে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। আজও হইতেছে।

অনার্য বাঙালী আর্য হইল, আর্য বাঙালী বৌদ্ধ হইল, কিন্তু তাহার অন্তরের পিপাসা মিটিল না। কিছুকাল পরে সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ভগবান বুদ্ধের বাণীতে অথবা জিনাচার্যগণের ধর্ম-উপদেশে সাম্যবাদের যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল কার্যক্ষেত্রে তাহার কিছুই নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ, বৌদ্ধ রাজা এবং বৈদিক সম্রাট্ প্রজাসম্পর্কে উভয়েই সু-উচ্চ সিংহাসন-সমাসীন। কেহ হয়তো প্রজাপীড়ক, কেহ প্রজারঞ্জনকারী, কিন্তু কার্যতঃ উভয়েই প্রজাশোষক। যে অনাবিল প্রেম ও উদার সাম্যের প্রতিশ্রুতি বৌদ্ধধর্মে বিঘোষিত হইয়াছিল, তাহা রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো নহেই—ধর্মের ক্ষেত্রেও সব সময় রক্ষিত হইল না। বৌদ্ধদের মহাযান মতই বাঙলা দেশ সাগ্রহে বরণ করিয়াছিল; কারণ মহাযান উদারতর, তাহার আকাঙ্ক্ষা শুধু আত্মোদ্ধার নয়—জগতের উদ্ধার। বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্মই মহাযানে বড়। এই মহাযান শেষে সহজযানে রূপান্তর লাভ করিল। সহজযানী বলিলেন, মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপপুণ্য বলিয়া কোন জিনিসই নাই। ইহা প্রাণধর্মী বাঙালীর চিত্তকে প্রথম প্রথম খুবই মাতাইয়া দিয়াছিল। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলাদেশে সে যুগে নানারাগে সন্ধ্যাভাষায় যে কাব্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মূল সুর—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়—"বাপু হে, সবই তো শূন্য, সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য, তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই এটা কেবল ধোঁকা মাত্র। এই ধোঁকার পশরা নামাইয়া ফেল। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ কর। আনন্দই শেষ পর্যন্ত থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।" এই আধ্যাত্মিক আনন্দ কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাশবিক পঞ্চকাম উপভোগে পরিণত হইল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই বলিতেছেন, "যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্রবিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, যে চরিত্রবিশুদ্ধির জন্য হীনযান

হইতেও মহাযান মহত্তর, যে চরিত্র বিশুদ্ধির জন্য আর্যদের 'চরিত্র-বিশুদ্ধি প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্রবিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল।…" ধর্ম ব্যভিচারপূর্ণ হইয়া উঠিলে তাহাতে সাম্যও থাকে না, মহত্ত্বও থাকে না। সত্যশিবসুন্দরের পূজারী বাঙালী পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিল।

বৈদিক আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালী মনীষা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ বাঙালী গৌড়মীমাংসক শালিকনাথ, ভবদেব ভট্ট, তাহার প্রমাণ বাঙালী হলায়ুধ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, তাহার প্রমাণ মধুসূদন সরস্বতী, মহেশ্বর, বাসুদেব সার্বভৌম। সাংখ্যের প্রবর্তক বাঙালী কপিল। তাঁহার আশ্রম নাকি ছিল গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে। পতঞ্জলির য়োগ-দর্শন আর্যসভ্যতার একটি বিশেষ দান। এই পথে বাঙ্গালীর দানও কম নয়। আদিনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ময়নামতী, গোপীচাঁদ প্রভৃতি এই পথের গুরু। এই সব পথে বাঙলা দেশ যোগমতেরও একটা বিশিষ্ট পথ নির্দেশ করিয়াছে। এ সব সত্ত্বেও বৈদিক আর্যসভ্যতা যেই অসাম্যনীতিদুষ্ট দম্ভের প্রতীক হইয়া উঠিল তখন বাঙলাদেশ তাহাকে বর্জন করিতে ইতস্ততঃ করিল না।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মও ঠিক ওই কারণে বাঙলায় টিঁকিল না। উক্ত দুই ধর্মের বীজ বাঙলার উর্বর মৃত্তিকায় বিস্ময়কর ফসল ফলাইয়া গেল বটে,—ইতিহাসে দেখিতে পাই সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু বাঙালী, মহাযান-আচার্য শান্তরক্ষিত বাঙালী, নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ শীলভদ্র বাঙালী, তিব্বতের ধর্মগুরু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বাঙালী, চর্যাপদে ও দোহাকোষে বাঙ্গালীর প্রতিভা দেদীপ্যমান, সে যুগের ভাস্কর্যে বাঙালী শিল্পীর দান ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে, তবু কিন্তু বৌদ্ধ রাজত্বকে বাঙলাদেশ সহ্য করিল না তাহার যথেচ্ছাচারের জন্য। তাহার

শিল্পী মনই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। শশাঙ্ক-প্রমুখ বুদ্ধবিদ্বেষী শক্তিশালী সম্রাটের উদ্ভব হইল এবং যে বঙ্গদেশ একদা সাম্যের আশায় বৌদ্ধধর্মকে বরণ করিয়াছিল সেই বঙ্গদেশই বৌদ্ধধর্মকে সাম্যের পরিপন্থী এবং কুনীতির আকর বলিয়া বিদলিত করিতে লাগিল। অন্যায়কে, অসুন্দরকে, উন্নাসিক আধিপত্যকে বাঙালী কোনদিনই সহ্য করে নাই। এই আদর্শ-প্রীতির জন্য বাঙালী অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে। বাধ্য বালকের মতো সেদিন বাঙালী যদিকোনও শক্তিশালী বৌদ্ধরাজার নিকট অবনতি স্বীকার করিত, তাহা হইলে পরবর্তী যুগে তাহাকে বোধ হয় একাধিক বৈপ্রান্তিক আক্রমণে বিব্রত হইতে হইত না, মাৎস্যন্যায়ের কবলেও পড়িতে হইত না। কিন্তু যাহার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, বাঙালী তো কিছুতেই তাহার নিকট শির নত করে না, কিছুদিনের জন্য করিতে বাধ্য হইলেও অবশেষে সে যে সেই অবাঞ্ছনীয় শৃঙ্খল ছিন্ন করে ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য। ইহাই বাঙালীর মজ্জাগত স্বভাব।

ইহার পরবর্তী যুগে বাঙলার ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি বাঙালী সাধারণতন্ত্র বা রিপাব্‌লিক স্থাপন করিয়াছে। মাৎস্যন্যায়ের পাশবিকতায় সমস্ত বাঙলাদেশ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন সহসা বাঙালী প্রতিভা যেন আত্ম-আবিষ্কার করিল। বাঙলার ক্ষুদ্রবৃহৎ নায়কেরা এবং বাঙলার প্রকৃতিপুঞ্জ একমত হইয়া গোপালদেবকে রাজপদে বরণ করিলেন, একটি কেন্দ্রীভূত শাসনপরিষদের সহায়তায় দেশের সুখশান্তি ফিরাইয়া আনিলেন, বহিঃশত্রুর প্রতিরোধ করিলেন। 'বাঙালীর ইতিহাস'-পুস্তক-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"এই শুভবুদ্ধির ফলে বাংলাদেশ নৈরাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক শত্রুর কাছে বারবার অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল। শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই এ ধরণের সামাজিক বুদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃষ্টান্ত

বিরল। পাল রাজাদের লিপিতে এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই নির্বাচন কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও তাহা যথোচিত কীর্তন ও মর্যাদা লাভ করে নাই···।"

শূদ্র গোপালদেব যে পালবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা একাদিক্রমে সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। পৃথিবীর আর কোথাও কোন একটি বংশ এত দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজত্ব করে নাই। এই শূদ্রবংশের প্রভাবে বাঙলাদেশ একসময় উত্তর-ভারতে সার্বভৌমত্ব করিয়াছে। এই বংশের দেবপালের সময় পালসাম্রাজ্যের খ্যাতি ও মর্যাদা ভারতবর্ষের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং মলয় উপদ্বীপের অধিপতি যে দেবপালের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং নানারূপ ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই পাল রাজাদের আমলেই শিল্পী ধীমান ও বিটপাল, শিল্পী মহিধর, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী শশীদেব প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু আলোর পর যেমন অন্ধকার আসে, এই গৌরবময় যুগের পর তেমনি লজ্জাকর যুগও আসিয়াছিল। মাৎস্যন্যায়ের যুগে স্ব স্ব প্রধান আত্মকর্তৃত্ব দেশকে যেমন উৎসন্নের পথে লইয়া গিয়াছিল, সেই আত্মকর্তৃত্বই আবার নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিল এবং পালরাজ্যের অধঃপতনের কারণ
ব্যক্তিগত বা দলগত অহমিকার যূপকাষ্ঠে যখনই সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শকে বলি দেওয়া হইয়াছে, তখনই বাঙালী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গোপালদেব যে পালবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই পালবংশের বংশধরেরা যে বাঙালীর আদর্শ-বোধকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ মহীপালের সময় উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত-বিদ্রোহ। অল্প-স্বল্প বিদ্রোহ নয়, দুই পুরুষ ধরিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ, উদ্দেশ্য—পুনরায় স্বাধীন রাষ্ট্র সংস্থাপন করা। এই বিদ্রোহ করিয়া কিন্তু বাঙালী অভিজাতদের দমন করিতে পারে নাই, প্রকৃতিপুঞ্জ-নির্বাচিত রাজাও আর বাঙলার সিংহাসনে বসিবার সুযোগ

পান নাই। ইহার পর আমরা রাজত্ব করিতে দেখি বর্মবংশকে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বর্মবংশ হয় পাঞ্জাব না হয় উৎকল হইতে আসিয়াছিলেন। কিছুই আশ্চর্য নয়। বাহির হইতে সমাগত (হয়তো বাঙালীদের দ্বারা আনীত) রাজবংশের কর্তৃত্ব বাঙালী একাধিকবার সহ্য করিয়াছে, কিন্তু অধঃপতিত নিজের লোকের প্রভুত্ব সে স্বীকার করে নাই। স্বজাতি-প্রীতি অপেক্ষা আদর্শ-প্রীতি, শিল্প-প্রীতি তাহার চরিত্রে প্রবলতর। ইহার পরবর্তী সেন রাজগণও বাঙালী নহেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ নাকি সুদূর দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটকদেশবাসী ছিলেন। এই সেন রাজারা বাঙালী পালবংশকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া বাঙলাদেশের একচ্ছত্র রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। বাঙালী বহুকাল ধরিয়া সে প্রভুত্ব সহ্যও করিয়াছিল। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে এই কথাই মনে হয় যে, আদর্শ-বাদী বাঙালী জীবনের ও সমাজের উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করিতে পারে, এবং সে আদর্শের মূল সুর সাম্য ও শিল্পবোধ। অশিল্পী বর্বর অসাম্যবাদী দাম্ভিক ব্যক্তি যদি তাহার আপনজনও হয়, তাহাকে বিষবৎ ত্যাগ করিতে বাঙালী কোনদিন দ্বিধা করে নাই। প্রাণধর্মী শিল্পসঙ্গত আদর্শই তাহার অন্তরের বস্তু। অতি বিশুদ্ধ কাঠখোট্টা আদর্শও সে বরদাস্ত করিতে পারে না, তাহার সাম্যবোধ পাউণ্ড শিলিং পেন্সের মানদণ্ডে নির্ণীত নহে, তাহার আদর্শের মাপকাঠি আছে তাহার প্রাণধর্মী শিল্পচেতনায়। এই আদর্শই তাহার সব। দেশপ্রেম যতক্ষণ তাহার এই আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে খাপ খায় ততক্ষণ সে দেশপ্রেমিক, রাজা যতক্ষণ তাহার আদর্শে আঘাত না করে ততক্ষণ সে রাজভক্ত, দেশের প্রচলিত ধর্ম যতক্ষণ তাহার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করে ততক্ষণ সে ধার্মিক। কিন্তু আদর্শে ঘা লাগিলেই বাঙালী বিদ্রোহী। দেশ ধর্ম আত্মীয়স্বজন কেহই তখন তাহার আপন নয়, যে তাহার আদর্শকে রক্ষা করিবে সেই তখন তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন, সে ব্যক্তি স্বদেশী বিদেশী বৈদিক বৌদ্ধ যে-ই হোক তাহাতে কিছুই

আসে-যায় না, বাঙালী তাহাকেই অন্তরের বেদীতে বসাইয়া পূজা করিবে। বাঙালী-চরিত্রের এই আদর্শপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া বহু বিদেশী বাঙলাদেশে আসিয়া আসর জমাইতে সমর্থ হইয়াছে।

পালরাজগণ—যাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গে কৈবর্তগণ বিদ্রোহ করিয়াছিলেন—সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। তাই বোধ হয় নির্যাতিত অধঃপতিত বাঙলার জনসাধারণ মুক্তির আশায় বৌদ্ধধর্মবিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজগণকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। নির্যাতন কিন্তু কমিল না। কারণ সেন রাজগণ নির্মমভাবে বৌদ্ধদলন আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ দরিদ্র জনসাধারণকেই পীড়ন করিতে লাগিলেন। কারণ বর্ণাশ্রম-ধর্মী বৈদিক আর্যসভ্যতায় যাহাদের গৌরবের স্থান ছিল না, যাহারা অনার্য, শূদ্র, দাস প্রভৃতি অপমানজনক আখ্যা লাভ করিয়া সমাজের নিম্নস্তরে হীন জীবন যাপন করিতেছিল তাহারাই একদা বৌদ্ধ হইয়াছিল। সেন রাজগণের বৈদিক শাসন ইহাদিগকেই নির্মমভাবে পেষণ করিতে লাগিল। অর্থাৎ বৌদ্ধ অভিজাত-সম্প্রদায়ের কবল হইতে পরিত্রাণের আশায় বাঙলার জনসাধারণ বৈদিক রাজার আধিপত্য স্বীকার করিল, মানে, তপ্ত কটাহ হইতে আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিছুকাল পেষণ চলিল। বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্মের সংঘর্ষে অভিজাত-সম্প্রদায়ের অবিচার-অত্যাচারে যখন ঘরে বাহিরে কোথাও শান্তি রহিল না তখন ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিল মুসলমান। ভারতের পশ্চিমসীমান্তে আগেই তাহারা হানা দিয়াছিল এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল বঙ্গ-বিহারের দিকে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, উত্তর-প্রদেশের গাহড়বাল রাজন্যশক্তিই নাকি মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করিয়া রাখিয়াছিল ; কিন্তু লক্ষ্মণসেন মগধ জয় করিয়া এবং প্রয়াগ পর্যন্ত সমরাভিযান করিয়া উক্ত গাহড়বাগ রাজন্যবর্গকে দুর্বল করিয়া দেন। প্রতিরোধকারীরা যখন দুর্বল হইয়া গেল তখন মুহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি বিনা বাধায় বিহার ও বঙ্গ জয় করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে বাধা দিতে পারিলেন না। জরার সঙ্গে যৌবনের যুদ্ধে

জরাকেই হার মানিতে হয়। বাঙলাদেশের রাজতন্ত্র তখন মৃতপ্রায়, লক্ষ্মণসেনের স্বপক্ষে জনসাধারণের আনুকূল্যও ছিল না, আত্মকর্তৃত্বের বল্মীক সিংহাসনের ভিত্তিকেও জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। শোনা যায় অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে, মাত্র সতরো জন অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। পলায়ন করা ছাড়া লক্ষ্মণসেনের গত্যন্তর ছিল না।

বঙ্গদেশে মুসলমান আসিল এবং এমন একটা সাম্যের আদর্শ লইয়া আসিল যাহা বিস্ময়কর; যাহার নিকট ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, শূদ্র সকলেই সমান, যাহার চক্ষে স্পেনের মুসলমান এবং বাঙলার মুসলমান একজাতি, আরবের মুসলমান এবং চীনের মুসলমানে কোনও তফাত নাই : যে ধর্ম ভৃত্যকে প্রভুর সহিত একাসনে বসিয়া এক পাত্র হইতে অন্নগ্রহণ করিতেও বাধা দেয় না, যে ধর্ম ক্রীতদাসকেও প্রভু-কন্যার পাণিপীড়নে অনুমতি দেয়। বাঙালীর অন্তর উদ্বুদ্ধ হইল। ইসলামসভ্যতার শিল্প-শ্রীও তাহাকে কম মুগ্ধ করিল না। তাহাদের সদর ও অন্দরের নবাবী বৈশিষ্ট্য, তাহাদের সুমাজিত সুমিষ্ট ভাষা, এক কথায় তাহাদের ইসলামী চালচলন বাঙালীর শিল্পী মনকে যে নাড়া দিয়াছিল তাহার প্রমাণ তাহার সাহিত্যে শিল্পে ভাষায় আজও জাজ্বল্যমান। বাঙালী কবি অশ্বারোহী মুসলমানকে ত্রাণকর্তা কল্কি অবতার বলিয়া বন্দনাই করিয়া বসিলেন।

নির্যাতিত বৌদ্ধগণ দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল, রাজধর্ম বলিয়া অনেক অভিজাত শ্রেণীর লোক মুসলমান হইতে লাগিল। হয়তো সমস্ত দেশই মুসলমান হইয়া যাইত, যদি না পুনরায় বাঙালী-প্রতিভা তাহাতে বাধা দিত। বাঙালীর ইহাও একটা বৈশিষ্ট্য। বাঙালী নূতন আদর্শে মুগ্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাকে সোৎসাহে গ্রহণ করে, কিন্তু যখনই সে আদর্শের গলদ ধরা পড়ে অমনই তাহার প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিভা নূতন পথের সন্ধান করিতে থাকে এবং এমন একটা পথ বাহির করে যাহা বাঙালী-প্রতিভারই

উপযুক্ত। পাঠান-শাসনের প্রবল প্রতিবাদ দুইজন বাঙালী বীরের কীর্তিতে অমর হইয়া আছে। একজন রাজা গণেশ, দ্বিতীয়জন দনুজমর্দনদেব। ইহারা সম্মুখ-সমরে দুর্ধর্ষ পাঠান-রাজাদের পরাভূত করিয়া তাহাদের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে, উচ্চকোটীমানবতার ক্ষেত্রে বাঙালী-মনীষা সে সময় যে দিব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল তাহা আরও বিস্ময়কর, তাহা সত্যই যুগান্তরকারী। এক দিকে আগমবাগীশ প্রভৃতি তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের দল বাঙালীর রক্ষণশীল মনের উপযোগী আন্দোলন করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব এমন একটা মধুর প্রেমের ধর্ম প্রচার করিলেন যাহার অবাধ উদারতা, যাহার মর্মস্পর্শী প্রেমময় আবেদন, সাম্যবাদী রসপিপাসু বাঙালী-সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিল। বিনা রক্তপাতে একটা বিরাট রাজনৈতিক বিদ্রোহ হইয়া গেল। বৈদিক, বৌদ্ধ, মুসলমান, ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ উন্নত-পতিত আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলকেই প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া বাঙালী-প্রতিভা যেন চরিতার্থ হইল। বৈষ্ণবধর্ম স্রোতের মুখ ফিরাইয়া দিল। ইসলাম ধর্মের সাম্য-মোহ বাঙালীকে আর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিল না। বরং অবশেষে সেই পুরাতন সত্যই সে পুনরায় আবিষ্কার করিল যে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণের ন্যায় মুসলমানেরাও রাজা, সাম্যের মহিমা প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন নাই, আসিয়াছেন প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিবার জন্য। অর্থাৎ আর একটা সমস্যা বাড়িল—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। মুসলমান রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের ষড়যন্ত্র এবং সেই ষড়যন্ত্রকে বিফল করিয়া দিবার জন্য ও ষড়যন্ত্র-কারীদের শাসন করিবার জন্য মুসলমান-রাজাদের নানাবিধ প্রচেষ্টা—ইহাই হইল সংক্ষেপে তখনকার রাজনীতি।

মুসলমানদের অত্যাচারে অবশেষে ভদ্র বাঙালীর মানসম্ভ্রম রক্ষা করাই দুরূহ হইয়া পড়িল। নিরুপায় বাঙালী অবশেষে তাহাই

করিল যাহা সে চিরকাল করিয়াছে। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পলাশীর যুদ্ধাঙ্গনে বাঙালী তাহাকে যে শিক্ষা দিল তাহা ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তিরই নিদর্শন এবং অতিশয় মর্মান্তিক।

একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। শত্রুকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বাঙালী বারংবার বাহিরের লোক ডাকিয়া আনিয়াছে কেন? এই সেদিনও তো নেতাজী জাপানের সাহায্য লইতে গিয়াছিলেন। বাঙালীর কি নিজের শক্তি নাই?

ইহার উত্তরে প্রথমেই একটা কথা বলা আবশ্যক। বাহির হইতে শক্তিশালী লোককে আহ্বান করিয়া অত্যাচারী গৃহশত্রুকে উচ্ছেদ কেবল বাঙালীই করে নাই, আরও অনেক জাতি করিয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতির জাতীয় ইতিহাসে ইহার একাধিক সাক্ষ্য বর্তমান। ইহা রাজনীতিরই একটা অঙ্গ। ইহাকে যদি কলঙ্কই বলিতে হয় তাহা হইলে ইহা সমগ্র সভ্যজাতির কলঙ্ক, একা বাঙালীর নহে। কারণ পৃথিবীর কোন সভ্যজাতিই তাহার আদিম রূপ বজায় রাখিতে পারে নাই, অধিকতর শক্তিশালী জাতির সংমিশ্রণ অল্পবিস্তর সকলের মধ্যেই অনিবার্যভাবে ঘটিয়াছে এবং সে সংমিশ্রণের ইতিহাস বাঙালী জাতির ইতিহাসের ভিন্ন সংস্করণ মাত্র।

তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলিবার আছে। যদিও পৌরাণিক গল্পে আমরা দেখিতে পাই যে, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এবং পৌণ্ড্রাজেরা, যদিও রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়াছিলেন বাঙালী তাম্রধ্বজ, ভীমের দিগ্বিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন বাঙালীরা, অর্জুনকেও সম্মুখসমরে আহ্বান করিয়াছিলেন বাঙালীরা, এবং এ সবের বহু পূর্বে দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গেও যদিও বাঙালী বীরেরা চতুরঙ্গ সেনা সাজাইয়া শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইতিহাসে যদিও আমরা গঙ্গা-রাঢ়ীদের বিবরণ, কৈবর্ত-বিদ্রোহ, বিজয়সিংহ, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, দেবপাল,

রাজা গণেশ, দনুজমর্দনদেব, কেদাররায়, চাঁদরায়, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, বাঙলার লাঠিয়াল প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করি, যদিও আধুনিক যুগের অরবিন্দ, বারীন, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, রাসবিহারী, বিনয় বোস, সূর্য সেন প্রভৃতি বাঙালী বীরেরা বাঙলার, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রণী নেতারূপে জ্যোতির্ময় গৌরবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান, আমাদের নেতাজী যদিও এই সেদিন অদ্ভুত সাহস, কৌশল ও বীর্যবলে সম্মুখসমরে শত্রুকে পরাজিত করিয়া বাহুবলে-অর্জিত স্বাধীন ভারতভূমিতে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও এই কিছুদিন আগেই কাশ্মীর-রণাঙ্গন হইতেও বাঙালী বীর রঞ্জিত রায়ের কীর্তি চতুর্দিকে বিঘোষিত হইয়াছে, তবু কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে পেশীতান্ত্রিক সমরপ্রতিভা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নহে। বাঙালী যুগে যুগে বিদ্রোহ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে বিদ্রোহ মনোজগতের বিদ্রোহ, মারামারি কাটাকাটি নহে। যখনই মারামারি-কাটাকাটির প্রয়োজন ঘটিয়াছে, বাহির হইতে পালোয়ান জুটিয়াছে এবং বাঙালী বুদ্ধি তাহাকে কাজে লাগাইয়াছে। বাঙালীর এই সমরবিমুখতার কারণ বঙ্গদেশের প্রকৃতি। যে দেশে প্রভূত পরিশ্রম না করিলে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় না, লুণ্ঠন করিয়া না আনিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যায় না, যে দেশের প্রকৃতি এত বিরূপ যে অহরহ শারীরিক পরিশ্রম না করিলে রক্তস্রোতই সচল থাকে না, অর্থাৎ যে দেশে নিছক জীবনযাপন করিবার জন্যই অবিরাম পেশী-সঞ্চালন করিতে হয় (এবং সেই জন্যই যে দেশের দর্শন উদার নয়, উদরকেন্দ্রিক) সেই দেশেই পেশীশক্তিশালী পরস্বাপহারী সামরিক জাতি জন্মগ্রহণ করে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই এসব হয়। শস্যশ্যামল বঙ্গভূমিতে এ রকম বীর জন্মিবে কেন ? যে দেশের গাছে গাছে ফল, মাঠে মাঠে ফসল, যে দেশের গঙ্গায় ব্রহ্মপুত্রে, যে দেশের ইছামতী-ময়ূরাক্ষী-কপোতাক্ষে, যে দেশের চূর্ণী-রূপনারায়ণ-দ্বারকেশ্বরে, সুবর্ণরেখায়, কংসাবতীতে, দামোদরে, অজয়ে, জলাঙ্গীতে,

মহানন্দায়, পদ্মায়, মেঘনায় বিগলিত পর্বতের প্রসাদলীলা তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছলিত, ঋতুতে ঋতুতে যে দেশের আকাশে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের দীপালী, মেঘমহিমার মহোৎসব, সে দেশের লোক স্বপ্ন দেখিবে, দার্শনিক হইবে, কাব্য লিখিবে, আদর্শ সৃষ্টি করিবে। শখের জন্য বা সাময়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া পেশীচর্চা করিলেও, পেশীচর্চাই তাহার জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না। যে দেশ বেদ-উপনিষদের মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে, বুদ্ধের অভিনব দর্শনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, চৈতন্যের প্রেমের ধর্মে অবগাহন করিয়াছে, সে দেশে কি বর্বরমনোবৃত্তি সৈনিকের উদ্ভব হইতে পারে? স্বাভাবিক নিয়মেই পারে না। তাই বাঙালীর শৌর্য চিন্তায়, পেশীতে নহে। তাহার সাম্য-অনুসন্ধিৎসু মন তাই বারংবার বহিরাগত বিদেশীর সাহায্য লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়াছে। বহিরাগত সভ্যতাকে সে গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে সভ্যতার কাছে সে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করে নাই।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বাহন হইয়া অধঃপতিতকে উদ্ধার করিবার সাধু মনোভাব লইয়া সাম্যের ও ন্যায়ের ছদ্মবেশ পরিধান করতঃ ইংরেজবণিক বঙ্গে পদার্পণ করিলেন। নূতন কিছু দেখিলেই বাঙালী আত্মহারা হইয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে বাঙালী ভাবে, ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে পাকা সাহেব হইয়া উঠিল। সেকালের ইয়ং-বেঙ্গলদের মতো পাকা সাহেবী-মনোভাবাপন্ন লোক ভারতবর্ষের অন্যত্র তো নহেই, ইংলণ্ড ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু সাহেবিয়ানার মধ্যেও খাদ ছিল, হিন্দুধর্মের খাদ এবং নবাবী আমলের খাদ। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে ইহার স্বরূপ চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি:—"ইংরেজি আমলের অনতিপূর্বে নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম এবং মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের রীতিনীতি উভয়ে বিবাহপাশে বাঁধা পড়িয়া বঙ্গদেশে নূতন এক সভ্যতার জন্মদান করিয়াছিল; সে সভ্যতার প্রধান আড্ডা ছিল কৃষ্ণনগর এবং তাহার প্রধান নায়ক

ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সেই হিন্দুসভ্যতা আমাদের পিতামহদিগের সময়ে যৌবনে পদনিক্ষেপ করিয়া কলিকাতায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল ও রাজা রামমোহন রায়কে আপনার অধিনায়ক-পদে বরণ করিল। পরিশেষে রাজা রামমোহন রায় উদ্যোগী হইয়া সেই নবাবী হিন্দুসভ্যতাকে জ্ঞানোজ্জ্বল ইংরেজি সভ্যতার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন, নব্যবঙ্গ সেই বিবাহের শুভফল।”

মুসলমান-রাজত্বের শেষ দিকে, ইংরেজ আসিবার কিছু আগে পর্যন্ত বাঙালী-প্রতিভা যেন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। একটা অত্যুর্বর জমি চাষের অভাবে যেন পতিত হইয়া পড়িয়া ছিল। পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার বীজ পড়িয়া সে জমিতে সোনার ফসল ফলিয়া উঠিল। ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালীর মনীষা সর্ববিভাগে ভারতের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিল। ভারতবর্ষের নবজাগরণের উষালগ্নে বাঙালী প্রতিভার সূর্য দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া দিল। মাত্র কয়েকটি নাম করিতেছি। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম গবর্নর—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, প্রথম আই. সি. এস. —সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম নোবেল-পুরস্কার পাইলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয় মনীষী—রাজা রামমোহন রায়, প্রথম হাইকমিশনার—অতুল চ্যাটার্জি, প্রথম কর্নেল—সুরেশ বিশ্বাস, প্রথম শবব্যবচ্ছেদক—মধুসূদন গুপ্ত, প্রথম ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রথম বৈমানিক—ইন্দ্রলাল রায়, প্রথম সার্জন-জেনারেল—মন্মথনাথ চৌধুরী, প্রথম চীফ-জাস্টিস—রমেশচন্দ্র মিত্র, প্রথম র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু, প্রথম হাইকোর্টের জজ—রমাপ্রসাদ রায়, কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রেসিডেণ্ট—সরোজিনী নাইডু, ভারতীয় চিত্রশিল্পের ধারা পুনঃপ্রবর্তক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম 'সত্যাগ্রহ'—বাঙলার নীলকরদের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন, অনশনে প্রাণ বিসর্জন করিলেন—যতীন দাস, ইংরেজী ভাষায় প্রথম ভারতীয় মহিলা কবি—তরু দত্ত, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম

ভারতীয় ডি. এস-সি.—জগদীশচন্দ্র বসু, প্রথম লর্ড ও আইন-সচিব—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন প্রথম—সার্ অতুল চ্যাটার্জি, সাংবাদিকতার জনক—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রথম ভাইসচ্যান্সেলার হন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ইঞ্জিনিয়ার—নীলমণি মিত্র, প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু, প্রথম মহিলা এম. বি.—ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, আমেরিকায় বেদান্তধর্মের প্রথম প্রচারক—স্বামী বিবেকানন্দ, মাউন্ট এভারেস্ট আবিষ্কারক—রাধানাথ শিকদার, ইয়োরোপে প্রাচ্য-নৃত্যের প্রথম জনপ্রিয় প্রদর্শক—উদয়শঙ্কর, আমেরিকায় জনপ্রিয় প্রথম ভারতীয় নট—শিশির ভাদুড়ী। আরও কত আছে।

অতি অল্পকালের মধ্যে জাতীয় জীবনের সর্ববিভাগে প্রতিভার এমন বিস্ময়কর আবির্ভাব আর বোধ হয় কোথাও ঘটে নাই।

ইংরেজী সভ্যতার তীব্র স্রোতে ভাসিয়াও বাঙালী কিন্তু আত্মসম্মান হারাইয়া আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই। সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান হইয়াও বাঙালীত্ব বজায় রাখিলেন; রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল, রাধানাথ, রামতনু সমাজ-বিদ্রোহী হইয়াও মনে-প্রাণে স্বদেশী রহিলেন, মাইকেল মধুসূদন হোমার-মিল্‌টনের ভজনা করিয়া অবশেষে 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা' লিখিলেন, রামমোহন রায় সাহেবদের অধীনে দেওয়ানি করিয়াও খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া খ্রীষ্টধর্মমুখী বাঙালী-চিত্তকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস পাইলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কট্‌কি চটি, থান ও চাদর পরিয়া লাটসাহেবের প্রাসাদ পর্যন্ত বিচরণ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের অধীনে ডেপুটিগিরি করিতে করিতে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, নবীনচন্দ্র লিখিলেন 'পলাশির যুদ্ধ', হেমচন্দ্র গাহিলেন 'ভারতসঙ্গীত', ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নাস্তিক-প্রকৃতি নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিবেকানন্দ হইলেন, ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডিকে সমস্ত বিশ্বে প্রসারিত করিয়া বাঙালী কেশবচন্দ্র সর্বধর্মসমন্বয়ের বিরাট পরিকল্পনা করিলেন, বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া বাঙলার পল্লীপ্রান্তে আসিয়া বিশ্বভারতীর আসন পাতিলেন, বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর প্রেম-বৈরাগ্য-ভরে ঐশ্বর্যের শিখর হইতে দেশের ধূলিতে নামিয়া আসিতে পারিলেন, ইংরেজের প্রভুত্ব-প্রতীক লোভনীয় আই. সি. এস. চাকরির মোহ ত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্র স্বদেশের জন্য কারাবরণ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

আদর্শবাদী বাঙালী কোনও সভ্যতার সংঘাতেই আদর্শচ্যুত হয় নাই। আদর্শের জন্য সে সব করিতে পারে। কেবল অসাম্য ও সঙ্কীর্ণতা সে সহ্য করিতে পারে না।

একটা কথা প্রায়ই অনেকের মুখে শুনিতে পাই, বাঙালীর নাকি সর্বভারতীয় দৃষ্টি নাই, তাহার মনোভাব নাকি বড় বেশি প্রাদেশিক, তাহার নিখিল-ভারতীয় প্রেম শিক্ষা করা উচিত। ইহা যেন জননীকে অপত্য-স্নেহ শিক্ষা দেওয়া।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—"শুধু রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াই নয়, ব্যবসা বাণিজ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াও বাংলাদেশ নখিল ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত—কাশ্মীর হইতে সিংহল এবং গুজরাট হইতে কামরূপ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের বাহিরে—তিব্বতে ব্রহ্মদেশে সুবর্ণদ্বীপে, পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রশায়ী অন্যান্য দেশ ও দ্বীপগুলিতেও তাহার যোগাযোগ নানাসূত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কাজেই প্রান্তীয় দেশ বলিয়া বাংলাদেশ শুধু তাহার পুকুরপাড়ে বটের ছায়ে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিজের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ লইয়া একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করিত এমন মনে করিবার কারণ নাই…।"

ইহা গেল প্রাচীন বাঙলার কথা। মাঝে কিছুদিন—সেন-পর্বের শেষভাগে সে হয়তো কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার পরেই আবার দেখি তাহার চৈতন্য প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া সমগ্র মানব-জাতিকেই আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। বাঙলার চণ্ডীদাস গান ধরিয়াছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

আধুনিক যুগের ইতিহাস তো সকলেরই সুবিদিত। কংগ্রেস হইবার বহু পূর্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে নিখিল-ভারতীয় প্রতিভার সংস্পর্শে আনিবার জন্য সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথই। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানে সর্বভারতীয় বিদ্বৎসমাজকে বাঙালীই আমন্ত্রণ করিয়াছিল। এবং সেই-জন্যই বাঙালীর উপরই ইংরেজের রাগ সর্বাধিক। ইংরেজ জানিত যে, বাঙালীই তাহার একমাত্র শত্রু, ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদে ফাটল ধরাইয়াছে বাঙালীই। তাই বাঙালীকে জব্দ করিবার আয়োজন সে বরাবর করিয়াছে এবং ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে ভালভাবেই করিয়া গিয়াছে। আজ আমরা যে দুর্দশা ভোগ করিতেছি, ইংরেজের বিরাগ তাহার অন্যতম কারণ। অগ্নিযুগের বোমা-বিস্ফোরণ এবং তৎপরবর্তী যুগের স্বদেশী-আন্দোলন যে শুধু ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে কাঁপাইয়া দিয়াছিল তাহা নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুখের ঘরেও আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। লর্ড কার্জন বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবার জন্য বঙ্গবিভাগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বাঙালীরাই ইংরেজের একমাত্র শত্রু। তাই বাঙালীকে হীনবল করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের বীজ তখনই তিনি বপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা তখন সফল হয় নাই, এখন হইয়াছে। এক আদর্শভ্রষ্ট স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য জনকয়েক নেতা আজ পাঞ্জাব ও বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর বারণও শোনেন নাই। এই স্বাধীনতার জন্য বাঙালী একদিন রক্তপাত করিয়াছিল, আজও তাহার রক্তমোক্ষণ চলিতেছে। বস্তুতঃ বাঙালী

যেদিন হইতে সর্বভারতীয় স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করিয়াছে সেদিন হইতেই তাহার দুর্দশার আরম্ভ। তাহার পরই ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড কায়েম করিয়াছেন, আইনের পর আইন প্রণীত হইয়াছে বাঙালী-দলনের জন্য। বেহার ফর বেহারীজ, আসাম ফর আসামীজ প্রভৃতি প্রাদেশিক বুলিও শোনা গিয়াছে বাঙালীর স্বদেশী-আন্দোলনব্রত গ্রহণ করিবার পর হইতে। এখনও শোনা যাইতেছে। ইংরেজের আমলে তবু খানিকটা ন্যায়বিচার ছিল, গুণের আদর ছিল, এখন যেন তাহাও নাই। প্রাদেশিক ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের ফলে আমরা ক্রমশঃ উগ্রভাবে প্রাদেশিক হইয়া উঠিতেছি, বাহিরে একটা সাম্যের ঢং বজায় আছে বটে কিন্তু তাহা যে একটা রঙ্গমঞ্চীয় প্রসাধন মাত্র, বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট তাহা একটুও অগোচর নাই। প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষ আর্যাবর্ত, মগধ, গৌড়, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, সমতট, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, বঙ্গাল, চোল, রাষ্ট্রকুট প্রভৃতি নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিত। আমাদের অতি-আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রও নানা প্রদেশে বিভক্ত, তাঁহারা খোলাখুলিভাবে পরস্পরকে আক্রমণ না করিলেও মনে মনে এবং মাঝে মাঝে ফতোয়া জারি করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছেন। আমার মনে হয় পাকিস্তানের বীজ যেন প্রত্যেক প্রদেশেই উপ্ত হইয়া আছে, যে কোন মুহূর্তে তাহা আত্মপ্রকাশ করিলে বিস্ময়ের কিছু হইবে না। এই প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বাঙালীর ধাতে সহ্য হয় না। কারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় উদার স্বাধীনতার জন্যই সে জেলে গিয়াছে, ফাঁসি গিয়াছে, দ্বীপান্তরে গিয়াছে, জীবনের সমস্ত সুখশান্তিকে বিসর্জন দিয়াছে, আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহার সর্বভারতীয় দৃষ্টি তো সুবিদিত। বর্তমানের প্রদেশ-বিভাগের ফলে তাহাকে আজকাল বলিতে হইতেছে বটে যে বেঙ্গল ফর বেঙ্গলীজ, কিন্তু ইহাতে তাহার প্রাণের সুর ঠিক যেন লাগিতেছে

না। বাঙলা দেশের আধুনিক সাহিত্য খ্রীষ্টান মিশনরিদের জয়গানে মুখরিত, বিদেশী ডেভিড হেয়ার আমাদের আপন লোক, অবাঙালী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙলা-সাহিত্যের পূজ্য লেখক, এণ্ড্রুজ সাহেবের স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙালী আকুল। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগীয় সাধুদের যে বাণী সংগ্রহ করিতেছেন তাহা কেবল বাঙালী সাধুদেরই বাণী নহে, তাহা সর্ব-ভারতীয় সাধনার সঞ্চয়ন-ভাণ্ডার। এই সেদিন পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের উচ্চাসন নির্দিষ্ট থাকিত প্রকৃত গুণীর জন্য, কেবলমাত্র বাঙালীর জন্য নহে। অধ্যাপক রমন, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্, বর্তমান রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তিব্বতী লামাগণ, আরবী-পার্সীর মৌলবীবৃন্দ সকলকেই বাঙলাদেশ তাঁহাদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে।

বাঙালীর প্রতিভা চিরকালই সর্বভারতমুখী, বিশ্বমুখী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। 'ঘর-জ্বালানে পর-ভোলানে' প্রেম প্রেম নয়। যে বাঙালীর বাঙালী-প্রেম নাই অথচ যিনি ভারত-প্রেমে উদ্বাহু, তাঁহার ভারত-প্রেম সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। মনে হয় ওটা আপাত-উজ্জ্বল মেকি একটা জিনিস। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়—"প্রেম বিস্তারের একটা বিহিত পদ্ধতি আছে। আগে প্রেম পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম গৃহাভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা দেশে বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম স্বদেশে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পর তাহা বিদেশে বিস্তৃত হয়। অগ্নির ন্যায় প্রেমের স্বভাবই প্রসারিত হওয়া। আপনার দেশের প্রতি তোমার প্রেম যথোচিত পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই যদি তাহা চকিতের মধ্যে সাত সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইয়া আসর জমাইয়া বসে, তবে সে প্রেমের ভিতর কোন পদার্থ নাই—কোন রসকস নাই—তাহা অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বর মাত্র। এ সকল ইঁচড়ে পাকা প্রেম হাঁটিতে শিখিবার

পূর্বেই দৌড়িতে ও লম্ফ দিতে আরম্ভ করে। আপনার মা-বাপের পরিচয় পাইতে না পাইতেই অপর লোককে মা-বাপ বলিতে শেখে। এইরূপ ভূতগত প্রেমকে কেহ কেহ বলেন সার্বভৌমিক উদারতা, কেহ বলেন বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা, আমরা বলি গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি।…"

বলা বাহুল্য, সুস্থমনা কোনও বাঙালীর এরূপ হাস্যকর ভারত-প্রেম নাই। বাঙালীর গুণকীর্তন করিবার জন্য আমি বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। ইতিহাসের নজীরে আমি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি কোথায় বাঙালীর শক্তি, কোথায় তাহার দুর্বলতা। আমার ধারণা হইয়াছে, বাঙালী আদর্শপ্রিয় ভাবপ্রবণ শিল্পীর জাতি। তাহার সঙ্গীতে ছন্দপতন ঘটিলেই, তাহার জীবনবীণা বেসুরা বাজিলেই সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছে, রাজ্যের উত্থানপতন ঘটাইয়াছে। এই শিল্পীর জাতি যখনই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে, তখনই তাহার জীবনে প্রতিভার দীপ্তি নানা দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সে একবার পাইয়াছিল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের আমলে। ঐতিহাসিকদের মতে সেই যুগই ভারতের স্বর্ণযুগ, সেই স্বর্ণযুগের দ্যুতি বাঙলাকেও উজ্জ্বল করিয়াছিল। ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগেও দেখি বাঙালী-প্রতিভা সমস্ত ভারতবর্ষকে মহিমান্বিত করিয়াছে, তাহারও একমাত্র কারণ ইংরেজশাসনের প্রথম যুগে বাঙালীরা সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল; ভাত-কাপড়ের জন্য তাহাকে এমনভাবে আত্মবিক্রয় করিতে হয় নাই। যখনই বাঙালীকে পেটের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, তখনই তাহার চরিত্র শুধু যে নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে তাহা নয়, তাহার শিল্পীমন তির্যক-পথে তাহার চরিত্রে এমন সব দোষের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা লজ্জাকর। বাঙালীর একতা নাই, বাঙালী পরশ্রীকাতর, বাঙালী পরনিন্দা করে, বাঙালী চাকুরি-প্রিয়। আমার মনে হয় এ সমস্তই দারিদ্র্যপীড়িত শিল্পীচরিত্রের বিকৃত রূপ অথবা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কারণ তাহার

শিল্পসৃষ্টি মানবতাকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত, অত্যুচ্চ মহামানবতার প্রতি তাহার তেমন টান নাই। প্রাচীন বাঙালী কবিদের কাব্য সাধারণ লোকদেরই জীবনলীলার আলেখ্য। চর্যাপদের কবি তো ডোম্বিনীর প্রেমে মাতোয়ারা, আনন্দই তাহার লক্ষ্য, জাতিকুলের আড়ম্বর নয়, শুষ্ক জ্ঞানচর্চা নয়, আধ্যাত্মিকতার কৃচ্ছ্রসাধন নয়। স্বর্গের দেবদেবীরাও তাঁহাদের মহিমান্বিত রূপে বাঙালীর কাছে আমল পান নাই, আমল পাইয়াছেন ধূলায় নামিয়া আসিয়া বাঙালীদের সহিত ঘরকরনা করিয়া। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—“বাংলাদেশ দেবভূমি নয়, এ দেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ ক’রে নিয়েছে। বাংলার শিবে-দুর্গায় বাঙালী চরিত্রেরই প্রকাশ। গঙ্গা-গৌরীর কোন্দলে শিব-দুর্গার কলহে আমাদেরই ঘরোয়া ঝগড়া। ভালোমন্দ সব নিয়েই আমাদের শিব আমাদেরই আপনমানুষ। বাঙালীর রাম তো বাল্মীকির রাম নন। আমাদের কৃষ্ণকেও শাস্ত্রে খুঁজে পাই নে অথচ আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁকে খুবই দেখতে পাই···।” বাঙালীমাত্রেই অনুভব করিবেন রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি কত সত্য। অমন যে প্রবল প্রতাপান্বিত সূর্যদেব, বৈদিক কবি গুরুগম্ভীর সংস্কৃত মন্ত্রে যাঁহার স্তব করিতেছেন উদাত্ত ভাষায়—

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

সেই সূর্য বাঙালীর ব্রতকথায় একেবারে ঘরের মানুষ—

আসবেন সূর্য বসবেন পাটে
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে
গা হেলাবেন সোনার খাটে
পা মেলাবেন রূপোর পাটে।

আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যেও দেখি ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ রামের অপেক্ষা রাবণই বেশি মহিমান্বিত। রবীন্দ্রনাথ সেদিনও তাঁহার এক

প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—"দেখতে পাই ফলস্টাফের সঙ্গে কন্দর্পের তুলনা হয় না, অথচ সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার থেকে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নেই, লোকসান আছে ফলস্টাফকে বাদ দিলে। সীতার চরিত্র রামায়ণে মহিমান্বিত বটে কিন্তু স্বয়ং বীর হনুমান, তার যত বড় লাঙ্গুল তত বড়ই সে মর্যাদা পেয়েছে। সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীমবাস্তব, রামচন্দ্র যিনি শাস্ত্রের বিধি মেনে ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন তার চেয়ে লক্ষ্মণ বাস্তব যিনি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে তার অশাস্ত্রীয় প্রতিকার করতে উদ্যত ··।" এই রবীন্দ্রনাথেরই বিখ্যাত কবিতা এবং বাঙালী জনসাধারণের মর্মবাণী—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।···

এই বন্ধনময় ভাবাবেগই বাঙালী শিল্পীর বিশিষ্টতা। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে বৈদিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে রবীন্দ্র-সাহিত্যও চিরকাল ভাবাবেগ-প্রধান থাকিতে পারে নাই, ক্রমশঃ তাহা বিশুদ্ধ বুদ্ধির মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যে-ই উঠিয়াছে অমনি তাহা সাধারণ বাঙালীর রসবোধের সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। মুষ্টিমেয় কৃতবিদ্য অথচ রসিক বাঙালী ছাড়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসাস্বাদন কয়জন করিতে সক্ষম? সাধারণ বাঙালী পান করিতে চায় তাহার দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ-মন্থিত অমৃত। বাঙলার বাজারে তাই 'গোরা' 'চতুরঙ্গ' অপেক্ষা 'বিন্দুর ছেলে' 'অরক্ষণীয়া'র চাহিদা বেশি। রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয় অবশ্য, কিন্তু তাহা ঔপনিষদিক বা আধ্যাত্মিক আবেদনের জন্য নহে, জনপ্রিয় তাহাদের নিতান্ত-মানবিক আবেদনের জন্য।

সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনি!

ইহার মধ্যে হয়তো গভীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আছে, কিন্তু বাঙালী ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে ইহার অতি-স্পষ্ট করুণ কোমল ভাবটির জন্য। বাঙালীর ভাবধারা উদ্বেলিত তাহার মর্ত্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া। সে ভোগী। তাহার যত কিছু আত্মত্যাগ, তাহার কংগ্রেস, তাহার অগ্নিযুগের মৃত্যুপণ, তাহার তান্ত্রিকের শবসাধনা, তাহার বৈষ্ণবের প্রেমবিলাস সমস্তই জীবনকে বিচিত্ররূপে ভোগ করিবার জন্য। জীবনশিল্পী বাঙালী জীবনকে শিল্পীর মতোই উপভোগ করিতে চায়। সামাজিক জীবনে সেই জন্যই তাহার সাম্য-প্রীতি, সেই জন্যই তাহার স্বাধীনতার জন্য তপস্যা।

তাই মনে হয় বাঙালীর পরশ্রীকাতরতা হয়তো দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালীর সাম্যপ্রিয়তার বিকৃত রূপ, তাহার পরনিন্দাশীলতা হয়তো তাহার সমালোচক মনেরই বক্র পরিণতি, তাহার চাকুরিপ্রিয়তা হয়তো তাহার শিল্পীমনের অবসরপ্রিয়তার অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর। বাঙালীর একতা হইবে কি করিয়া? বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে প্রতি বাঙালীর চরিত্রে এমন একটা উদার অথচ বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, কোনও একটা বিশেষ মতবাদের গণ্ডিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়া বাঙালীর স্বভাবধর্ম নহে। তাহার চিন্তাধারা সত্যই ধারা, স্থিতিশীল নহে—গতিশীল। যে বাঙালী ইংরেজকে ডাকিয়া রাজপদে বসাইয়াছে, সেই বাঙালীই কংগ্রেস গড়িয়াছে, সেই বাঙালীই বোমা ছুঁড়িয়াছে, সেই বাঙালীই খদ্দর পরিয়া অহিংস সংগ্রাম করিয়াছে এবং সেই বাঙালীই এখন আবার মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা করিয়া রুশদেশে প্রবর্তিত কমিউনিজ্‌মের সাম্য-স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সাম্যনীতি-অনুমোদিত রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইলে যে একরঙা মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন, তাহা বাঙালীর নাই। স্ব-স্ব-প্রধান থাকাই তাহার ধর্ম, তাই একই বাঙালী-পাড়ায় পাঁচটা ক্লাব, ছয়টা থিয়েটারের আখড়া, তাই একাধিক বারোয়ারিতে

প্রিয়, আর নারীরা অপমানিতা, ধর্ষিতা বা ভ্রষ্টা। ইংরেজেরা প্রথমে যখন এ দেশে আসিয়াছিল, তখন বাঙলাদেশের সামাজিক অবস্থা ভয়াবহ ; সাহিত্য-শিল্প মৃতপ্রায়, ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মন্বন্তর-রাক্ষসের অট্টহাস্যে বাঙলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। কিন্তু কিছুদিন পরে ইংরেজের সংস্পর্শে যে-ই সে আধিভৌতিক সুখ-সুবিধা এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করিল, অমনি সঞ্জীবিত হইল তাহার প্রতিভা। সাহিত্যে সমাজে ধর্মে বাঙালী-প্রতিভার অগ্নি অভূতপূর্ব জ্যোতিতে সমগ্র ভারতকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। ইংরেজ আমলের শেষের দিক হইতেই কিন্তু সে অগ্নি ম্লান হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লইয়া অত্যধিক আস্ফালন যেন আমাদের মানসিক দৈন্য সূচিত করিয়াছে। কবিদের পুরস্কার-প্রাপ্তি প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িতেছে। কবি কৃত্তিবাস একদিন নাকি গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণের সভায় আসিয়া তাঁহাকে স্বরচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। শুনিয়া গৌড়েশ্বর পরম হৃষ্ট হইলেন, তাঁহার পারিষদেরা বলিলেন, "গৌড়েশ্বর আপনার উপর খুশি হইয়াছেন, এখন আপনি কি পুরস্কার চান বলুন। যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন।" কৃত্তিবাস উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কবি, আমি ভিক্ষুক নই। কবিতার বিনিময়ে সম্পদলাভ করিতে আমি আসি নাই। 'কারো কিছু নাহি লই, গৌরব মাত্র সার'।" কোন কবিই পুরস্কার লাভের আশায় কাব্য রচনা করেন না, রবীন্দ্রনাথও করেন নাই, পুরস্কারটা আকস্মিকভাবেই তাঁহার জীবনে আসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা লইয়া আমাদের আস্ফালনটা যেন একটু বেসুরা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতেই বাঙালীর সাহিত্য-সাধনাও যেন মূলতঃ একটা অর্থকরী পেশা হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও একটু বাহবা পাইবার জন্য, একটা পুরস্কার পাইবার জন্য আমরা যেন আজ লোলুপ। ইহা লইয়া প্রতিযোগিতার অন্ত নাই। সাহিত্য-সাধক তাঁহার সাধনার জন্য অর্থলাভ করুন, পুরস্কার লাভ করুন—

ইহা তো আনন্দের কথা। কিন্তু যখনই তিনি অর্থ বা পুরস্কারের লোভে ক্রেতা বা পুরস্কার-দাতাদের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইবেন তখনই তাঁহার পতন। নিদারুণ অর্থাভাবের সহিত বিলাস-লালসা সংযুক্ত হইয়া আজ অনেক প্রতিভাবান বাঙালী লেখককে বিভ্রান্ত করিতেছে। সিনেমা-অধিপতিদের নিকট আত্মসম্মান বিকাইয়া অনেকেই আজ যে কর্মে নিযুক্ত, তাহা দেশের এবং জাতির পক্ষে অকল্যাণকর, কারণ আজকাল দেখিতেছি অধিকাংশ সিনেমারই লক্ষ্য আমাদের পশুত্বকেই উত্তেজিত করা।

যে স্বাধীনতার জন্য বাঙালী তাহার সর্বস্ব খোয়াইয়াছে, সেই স্বাধীনতা আজ সমাগত। কিন্তু বাঙালী-জীবনের সেই অগ্নি কোথায়? নির্বাপিত হয় নাই, রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। শিল্প-প্রতিভা, কবি-প্রতিভা যখন বিকৃতরূপ ধারণ করে তখন তাহা আতঙ্কজনক, নারী যখন নগ্নিকা হয় তখন সে ভয়ঙ্করী কালী হইয়া উঠে—শিবের বুকে পা দিতেও তখন তাহার আপত্তি নাই, বরং তাহাতেই তাহার উল্লাস। ইংরেজ-রাজত্বের অবসানে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রপত্তনের সূচনায় অভাবের, অন্যায়ের, অবিচারের কবলে পড়িয়া বাঙালী জাতি আজ আর্তনাদ করিতেছে। ইতিহাসে তাহার এই আর্তনাদ শুনিয়াছি মাৎস্যন্যায়ের যুগে, পালরাজ্যের অবসানে, সেনরাজ্যের অধঃপতিত অবস্থায়, মুসলমান-রাজত্বের শেষভাগে। আজও বাঙালীর দুর্দশার নানা অভিব্যক্তি চতুর্দিকে করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে দেখিতে পাইতেছি। ঘরে বাহিরে কোথাও তাহার স্থান নাই, সর্বত্রই সে যেন প্রবাসী, তাহার উপার্জনের পথ রুদ্ধপ্রায়, তাহার সামাজিক বন্ধন শিথিল, তাহার ভাষা বিপন্ন, তাহার প্রতিভা অস্বীকৃত এবং সেই জন্যই উন্মার্গগামী, প্রতিদিনই মুখোশধারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতারা তাহার আদর্শপ্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, তাহার পুত্রকন্যারা গতানুগতিক পন্থায় পঠদ্দশা শেষ করিয়া অবশেষে অনিশ্চিত তিমিরে অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বর্তমান সাহিত্যেও ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট,

একাধিক পূজার জন্য একাধিক মোড়ল ব্যস্ত। সকলে একত্র হইয়া কিছু করা আমাদের স্বভাব নয়।

কেবল একটি ক্ষেত্রে বাঙালীর একতা আছে। সে ক্ষেত্রে সে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকেও বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া যায়। তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়ে যখন সে প্রতিভার দুর্লভ জ্যোতি দেখিতে পায়। প্রতিভাবান ব্যক্তির মতবাদকে বা কীর্তিকে সে হয়তো সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত করিয়া দেয়, কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তিটি তাহার মাথার মণি। বৈদিক ধর্মকে বাঙালী পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই, কিন্তু বেদ-উপনিষদের ঋষিরা আজও বাঙালীর নমস্য ; বৌদ্ধধর্ম বাঙলায় টিঁকিল না, কিন্তু বুদ্ধদেব বাঙলার অবতারদের মধ্যে একজন ; চৈতন্যদেবের শিষ্যানুশিষ্যগণ বাঙালীর কাছে অনেক স্থলে উপহসিত, কিন্তু নবদ্বীপের নিমাই বাঙালীর অন্তরের ধন ; রঘুনন্দনের বিধান বাঙালী সম্পূর্ণ মানিল না, কিন্তু রঘুনন্দনকে লইয়া বাঙালীর গর্বের অন্ত নাই ; রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম বাঙলাদেশের জনসাধারণ গ্রহণ করিল না, কিন্তু রামমোহন রায়ের ছবি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে ; বিদ্যাসাগরের সারা জীবনের সাধনা বিধবা-বিবাহ প্রচলন বাঙলা দেশে অপ্রচলিত, কিন্তু কোন্ বাঙালী বিদ্যাসাগরের নামে উল্লসিত হইয়া উঠেন না ? শান্তিনিকেতনের সহিত সাধারণ বাঙালীর প্রাণের যোগ নাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেক বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর। মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনায় বাঙালী পঞ্চমুখ, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিটিকে সে পূজা করিতে কখনও ইতস্ততঃ করে নাই। আজকালকার কথাই ধরুন না, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সমালোচক বাঙালী রাজনৈতিক ; কিন্তু দুরন্ত দামাল্ হঠকারী তেজস্বী জওহরলালকে, শিল্পী সাহিত্যিক জওহরলালকে কোন্ বাঙালী ভাল না বাসে ? কেবল স্বদেশী নয়, বিদেশী প্রতিভা সম্বন্ধেও বাঙালীর এই মনোভাব। বাঙালী শিল্পী এবং শিল্পীর সমঝদার। তাহার চরিত্রও শিল্পীসুলভ। বাহবা পাইবার জন্য, কৃতিত্ব দেখাইবার

জন্য সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে, কিন্তু আধিভৌতিক সুখ-সুবিধার জন্য কিছু করিতে সে অপারগ। বড় বড় সাম্রাজ্যের বড় বড় আপিসের আয়ব্যয়ের নিখুঁত হিসাব বাঙালীই চিরকাল রাখিয়াছে, কি করিয়া অর্থাগম হইতে পারে তাহার নানা বুদ্ধি সে অপরকে বলিয়া দিতেছে, নিজে কিন্তু সে দরিদ্র। টাটানগরের বিরাট সম্ভাবনা বাঙালী প্রমথনাথ বসুর মনীষাতেই একদা প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে রূপ দিল অন্য আর একজন অ-বাঙালীর কর্মদক্ষতা। বাঙালী আপিসের বেতনেই সন্তুষ্ট। যে একটানা অধ্যবসায় থাকিলে অর্থোপার্জন করা যায়, তাহা বাঙালীর নাই। অথচ অর্থের প্রতি তাহার বৈরাগ্যও নাই, দারিদ্র্য তাহার প্রতিভাকে বিকৃত করে। সে ভোগী, সে শিল্পী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি, বিশুদ্ধ আদর্শনিষ্ঠা, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত-সমন্বয় বাঙালী চরিত্রে বস্তুতান্ত্রিকতার ও ভাবপ্রবণতার, শক্তির ও দুর্বলতার অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে সে যেমন শক্তিধর, অন্যদিকে সে তেমন অসহায়। এই শিল্পীজাতিকে যদি কোনও রাষ্ট্র সন্তুষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলেই বিপ্লবের সম্ভাবনা। শিল্পপ্রতিভা অনেকটা আগুনের মতো। তাহাকে যদি ঠিকমতো যথাস্থানে রাখা যায় তাহা হইলে সে রাষ্ট্রের পরম বন্ধু। সে অমাবস্যার অন্ধকারকে দীপালীর মহিমায় উদ্ভাসিত করে, দুর্গমপথযাত্রীদের হস্তে মশাল-আলোকে প্রজ্বলিত হয়, ফ্যাক্টরি চালায়, কামানে গর্জন করে, রান্নাঘরের চুল্লীতে থাকিয়াও অন্নব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য সম্ভব করে। কিন্তু এই অগ্নি লইয়া অবহেলাভরে খেলা করিলেই বিপদ, অগ্নি তখন ধ্বংসলীলায় মাতিয়া উঠে।

অনুভব করিতেছি বাঙালীর জীবনে এই অগ্নি আজ কল্যাণকর মূর্তিতে নাই। ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য যে, যখনই একটা রাষ্ট্রের অবসান হইয়া নূতন রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে তখনই বাঙালী জাতির জীবনে এই অগ্নির, বাঙালীর শিল্পীমনের বিকৃতি ঘটিয়াছে। তখন দারিদ্র্যের পেষণে পুরুষরা অর্থহীন, আশাহীন, উদ্যমহীন, বাগাড়ম্বর-

কারণ পেটের দায়ে পপুলার হইবার জন্য অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিক আজ সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত। প্রকৃত সাধক সংখ্যায় খুব বেশি নাই। তাই দেখি আমাদের দুঃখদুর্দশার কাহিনী নানা সুরে ইনাইয়া বিনাইয়া বলা, অন্তঃসারশূন্য বীরত্বের ফাঁকা আওয়াজ করা, নানা ছুতায় জঘন্য যৌন-প্রকৃতিকে উদ্দীপ্ত করা, শ্রমিক-মজদুরদের লইয়া নকল ক্ষোভ প্রকাশ করা, পরনিন্দার মসলায় মুখরোচক করিয়া গালগল্প সাজাইয়া-গুজাইয়া বলা—এই সবই বর্তমানে অধিকাংশ বাঙালী কবির উপজীব্য। রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গ-সাহিত্যের সমৃদ্ধিরও দিক আছে, আমি আজ সে আলোচনা করিতেছি না। সে আলোচনা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লোকে নিশ্চয়ই একদিন করিবেন, কিন্তু আজ আমি নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেছি যে আমাদের সাহিত্য ও জীবন একপ্রস্থ ফসল ফলাইয়া আবার নূতন ফসলের আশায় রিক্তশ্রী হইতেছে। যে আবর্জনা ও জঞ্জাল আজ আমাদের জীবনে স্তূপীকৃত হইতেছে তাহাই একদিন সারে পরিণত হইয়া নবীন সৃষ্টিকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিবে। তাহার এই দীনতা, তাহার এই ক্ষোভ, তাহার এই উচ্ছৃঙ্খলতা আসন্ন বিপ্লবেরই প্রাথমিক ভূমিকা। বাঙালী বারংবার বিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার আদর্শ-উদ্বুদ্ধ শিল্পচেতনা তাহাকে বারংবার সঞ্জীবিতও করিয়াছে। অন্যায়কে অসত্যকে অসুন্দরকে অশিবকে উৎখাত করিবার জন্য সে বহুবার জীবনপাত করিয়াছে, আশা আছে আবার করিবে।

আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। একটি ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

জয়যাত্রায় বাহির হয়েছি কতকাল আগে মোরা
যাত্রা হয় নি শেষ
গিরি-মরু-বন কত অগণন একে একে হ'ল ঘোরা
বদল হ'ল যে বেশ,

দূর দিগন্ত পানে বার বার চাই
সেদিনের সাথী-সঙ্গীরা কেহ নাই
বুকভরা আশা ছিল যাহাদের
দেখিবে নূতন দেশ
দুর্গম পথে চলিতে চলিতে
হ'ল তারা নিঃশেষ।

তোমরা আসিবে নূতন পথিক নূতন বার্তা নিয়া
নূতন পথের বাঁকে
নবীন যুগের যুগন্ধরেরা দশদিশি সচকিয়া
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে
তোমাদের মুখে শুনিব বিজয়বাণী
হবে হবে জয় হবে হবে জানি জানি
স্বপনে যাহারে দেখেছি আমরা
পাব তার উদ্দেশ
কণ্টক ভেদি' হবেই একদা
কুসুমের উন্মেষ।

ভাগলপুর
১লা পৌষ, ১৩৫৯

কাব্য-প্রসঙ্গ *

যে মানসিক উৎকর্ষের জন্য মানুষ পশু হইতে বিভিন্ন, সাহিত্য সেই মানসিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। আমাদের আত্মদর্শন, আত্মবিচার, আত্মপ্রসাদ সমস্তই সাহিত্যের মাধ্যমে। সাহিত্যের সাহায্যেই বাস্তবের রূঢ় লোক হইতে প্রস্থান করিয়া আমরা স্বপ্নের গূঢ় লোকে আত্মহারা হই। সাহিত্যই আমাদের আনন্দ দেয়, সান্ত্বনা দেয়, আশা দেয়, উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরের ইহাই নিগূঢ়তম সেতু, সত্যতম সম্বন্ধ এবং দৃঢ়তম বন্ধন।

সাহিত্যের গণ্ডি আজ যদিও অতিশয় ব্যাপক—ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, সমাজনীতি, বস্তুতঃ মানবমনীষা-প্রসূত সমস্ত কিছুই যদিও আজ সাহিত্যের অঙ্গীভূত, কিন্তু 'সাহিত্য' বলিতে সাধারণতঃ আমরা সৃষ্টিধর্মী কাব্য-সাহিত্যই বুঝি। যে সাহিত্য আলোচনা করিবার জন্য আপনারা এই সভার আয়োজন করিয়াছেন, তাহা কাব্য-সাহিত্যই—ইতিহাস বিজ্ঞান বা রাজনীতি নহে।

সুতরাং কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধেই সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

কাব্যই আমাদের প্রাণের আশ্রয়-ভূমি।

ইতিহাস যখন অতীতের নজীর তুলিয়া বারংবার প্রমাণ করে যে, আমরা পশু ছাড়া আর কিছু নই, চিরকাল নখদন্ত বিস্তার করিয়া যুদ্ধই করিতেছি, রাজনীতি যখন নানা কৌশলে নানা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জঘন্য স্বার্থপরতাকেই মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে থাকে, অর্থনীতি সমাজনীতি—কোন নীতিই যখন আমাদিগকে পাশবিক স্বার্থনীতির উর্ধ্বে লইয়া যাইতে পারে না, বিজ্ঞান যখন স্পষ্ট ভাষায় বলে—তুমি তো পশুই, আত্মরক্ষাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম—তখন struggle for

* জামসেদপুরের চলন্তিকা-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণ।

existence-এর জ্ঞানগর্ভ বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র কবিই আমাদের বিভ্রান্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে—

"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

সুখের সন্ধানে যখন আমরা চতুর্দিক তোলপাড় করিয়া বেড়াই, জ্ঞান-বিজ্ঞান গুরু-বন্ধু অর্থ-সম্পদ কেহই যখন আমাদের সুখের সন্ধান দিতে পারে না, তখন কবির কাছেই আমরা কেবল সুখের সন্ধান পাই—

"সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো। শিশু-আননের
হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত, বিকশিত,
উন্মুখ অধরে ধরি চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি, চিরদিন।
বিশ্ব-বীণা হতে উঠি গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন।
... ...
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল
...সুখ অতি সহজ, সরল।"

আমাদের সাবধানী মন যখন অতি-সঞ্চয়ের বিজ্ঞতায় সব দিক সামলাইতে গিয়া শেষ পর্যন্ত কোন দিক সামলাইতে পারে না, কবির বাণীই তখন আমাদের উপদেশ দেয়—

"ফুরায় যা দে রে ফুরাতে
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা চাহি না বুঝিতে
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে

পূরিল না যাহা কে রবে বুঝিতে তারি গহ্বর পূরাতে
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ ফুরাইলে দিস ফুরাতে।"

চতুর্দিকে যখন হতাশা, চতুর্দিকে যখন অন্ধকার, তখন একমাত্র কবিই বলিতে পারেন—অন্ধকার সত্য নয়, অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আজকাল কিন্তু অনেকে কবির এই-জাতীয় বাণীতে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা কাব্যে রাজনৈতিক রিয়ালিস্‌ম্ সন্ধান করেন, তাহাতে অতি-আধুনিকতার প্রগতি দেখিতে চান।

রিয়ালিস্‌মের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই কি লোকে কাব্যের শরণাপন্ন হয় না?

একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষী কাব্যকে—Interpretation of life বলিয়াছেন। কথাটা সম্পূর্ণ হইত—Poet's interpretation of life বলিলে। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সমাজতন্ত্রী, ধনিক, শ্রমিক প্রত্যেকেরই নিজস্ব এক একটা interpretation of life আছে, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকটিই হয়তো বিদ্যায় বুদ্ধিতে যুক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু কেবল কবির interpretation-ই কাব্য। তাহাই মনোহারী এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইলেও তাহাই চিরন্তন সত্যের আধার। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, আরব্য-উপন্যাস, ডিভাইন কমেডি, ফাউস্ট, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, রবিন্সন ক্রুসো প্রভৃতি অমর কাব্যগুলিতে রিয়ালিস্‌ম্ আছে কি? শেক্‌স্পীয়রের নাটক, কালিদাসের কাব্য কি রিয়ালিস্টক? এমন কি ডল্'স হাউসের রিয়ালিস্‌ম্ কি সত্যই রিয়ালিস্‌ম্? যাহা বাস্তব তাহাতে রং না লাগাইলে কি কাব্য হয়? যাহা স্থূল তাহার স্থূলতার আবরণ উন্মোচন না করিলে কি তাহার সূক্ষ্ম মর্ম বোঝা যায়? যাহা স্থূল, যাহা বাস্তব, যাহা ঘটিতেছে, তাহা তো চোখের সম্মুখেই অহরহ রহিয়াছে, তাহার পরিচয় লাভের জন্য কবির কাছে যাইবার প্রয়োজন

কি? চোখ খুলিয়া রাখিলেই হইল। বিস্তৃততর বিবরণের জন্য খবরের কাগজ আছে—কবিকে খবরের কাগজের রিপোর্টারের পর্যায়ে নামাইয়া আনিবার এ হাস্যকর প্রয়াস কেন বুঝি না। কবি এমন কোন প্রয়োজনীয় খবর দিতে পারেন না যাহার বাজার-দর আছে। যে রত্ন তিনি অন্বেষণ করেন তাহা অরূপ রতন—যে লোকে তিনি উত্তীর্ণ হইতে চান তাহার ঠিকানা নিজেই তিনি জানেন না, অসহায়ভাবে কেবল আবৃত্তি করিতে থাকেন—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"। অন্তরের অন্তরতম লোকে তিনি যাহা অনুভব করেন, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষাই তিনি খুঁজিয়া পান না সব সময়ে—

"নবীন চিকণ অশথপাতায়
আলোর চমক কানন মাতায়
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে
কি চাই কি চাই বচন না পাই
মনের মতন রে।"

এই অনুভূতিই তাঁহার কাছে রিয়েল এবং ইহারই প্রতিধ্বনি রসিকের চিত্তে সত্যকে মূর্ত করিয়া তোলে।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা বিচলিত হইলেও কবি-সত্তা সহসা বিচলিত হয় না। কারণ যিনি কবি তিনি অসাধারণ। সাধারণ লোক যে রাজনৈতিক কারণে উত্তেজিত বা অবসন্ন হয় সে রাজনৈতিক কারণ কবির কাব্যলোককে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। রাজনৈতিক সমস্যা কবির সমস্যাই নয়, রাজনৈতিক খবর আর কাব্যলোকের খবর এক নয়। যুদ্ধের খবর লইয়া যখন সবাই উন্মত্ত, তখন কবির মনে হয়—

ফাটিতেছে বোমা, কাঁপিছে ধরণী কামান-রবে
টুঁটির উপর চাপিয়া বসেছে দাঁতের পাটি—

নূতন খবর খুব কি বন্ধু ? শকুনি শবে
চিরকাল ধ'রে জুড়িয়া রয়েছে ধরার মাটি।
চিরকাল ধ'রে মরেছে জন্তু, শকুনি তাদের খেয়েছে ছিঁড়ে,
চিরকাল ধ'রে অসহায় চাল চ্যাপটা হইয়া হয়েছে চিঁড়ে,
চিরকাল ধ'রে তবু মহাকাল মরণ-বীণায় নিখুঁত মীড়ে
জীবনের সুর বাজায় খাঁটি,
চিরকাল ধ'রে বুক দিয়ে ঘিরে নূতন জননী নূতন নীড়ে
নূতন জীবনে বাঁচাইয়া রাখে কি পরিপাটি !

চিরকালের চিরন্তন খবরই কাব্যলোকের খবর, সমসাময়িক রাজনৈতিক খবর নয়।

কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। বিখ্যাত কবিদের কাব্যে তাঁহাদের সমসাময়িক আন্দোলনের কতটুকু পরিচয় আমরা পাই? ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-হোমার-ভার্জিল-গয়টে-দান্তের কাব্যে আমরা চিরন্তন মানবমনের প্রতিচ্ছবিই দেখি, মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আকূতির আলোকেই সেগুলি দেদীপ্যমান, কিন্তু সে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ ছবি বিশেষ একটা দলের বা মতের স্বপক্ষে ওকালতির কোন চিহ্ন তো সে সবে নাই। শেক্স্পীয়রের কাব্যে আমরা এলিজাবেথান যুগের বিক্ষোভের কতটুকু প্রতিফলন দেখি ? মিল্টন তাঁহার প্রথম জীবনে রাজনীতি লইয়া মাতিয়াছিলেন, রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধও হইয়াছিলেন, রাজনীতি লইয়া কিছু কিছু রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইজন্যই কি আমরা মিল্টনকে মনে রাখিয়াছি ? মিল্টনের সেই রাজনৈতিক জীবনে মিল্টন নিজেই অনুভব করিয়াছেন যে, he was neglecting his great gift of Poetry. তাঁহার সেই রচনাগুলি আমরা এখনও মাঝে মাঝে পড়ি প্যারাডাইস লস্টের কবির রচনা বলিয়া। প্যারাডাইস লস্টে কমন্‌ওয়েল্‌থের কোন উল্লেখ নাই।

শেলী কীটস বায়রন কেহই সমসাময়িক রাজনীতিকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন নাই। কেহ কেহ হয়তো দুই-চারিটা সনেট লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়। টল্‌স্টয়ের জীবদ্দশায় রুশদেশ যখন জারের পীড়নে আর্তনাদ করিতেছিল, তখন তিনি অ্যানা কারেনিনার প্রেমের কাহিনী লিখিয়াছিলেন। জারের অত্যাচার তাঁহার কোন কাব্যের বিষয় হয় নাই। যেসব কাব্যের জন্য ডস্টয়েভ্‌স্‌কি শেখব জগদ্বিখ্যাত, তাহা চিরন্তন মানব-মানবীর কাব্য—বিশেষ একটা রাজনৈতিক মতবাদের নয়। অথচ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবন রাজনৈতিক আবর্তে আবর্তিত হইয়াছিল।

বাঙলা সাহিত্যেও ইহার প্রচুর উদাহরণ বর্তমান। সিপাহী-বিদ্রোহের ধূমে ও গর্জনে যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগন আচ্ছন্ন, মাইকেল মধুসূদন তখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া পুলিস আদালতে চাকুরি করিতেছেন। তাহার পরই—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই – তিনি যে সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন, তাহা সিপাহী-বিদ্রোহ-বিষয়ক কাব্য নয়—রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ। সিপাহী-বিদ্রোহের মতো অত বড় একটা রাজনৈতিক ঘটনা তাঁহার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিল না। তিনি যখন মেঘনাদবধ কাব্য লিখিতেছিলেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের কবলে। তাঁহার কাব্যে সে দুর্ভিক্ষের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না। ইহার পরই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি যখন দুর্গেশনন্দিনীর রোমান্স রচনা করিতেছিলেন, তখন লর্ড এল্‌গিন ওহাবী-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের বিদ্রোহ-নিবারণে ব্যস্ত। সে বিদ্রোহ বা তাহা নিবারণের প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে তিলমাত্র বিচলিত করে নাই। তাহার কয়েক বৎসর পরে লর্ড লিটনের আমলে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষে, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টে, আফগান যুদ্ধে আলোড়িত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা সমসাময়িক ঘটনা লইয়া নয়। ওই

কাব্যগুলিতে যে সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাহা চিরন্তন। সর্বদেশের সর্বকালের সকল মানবকে তাহা উদ্বুদ্ধ করিবে। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনেও বহু উত্তেজনাজনক রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু সেসব লইয়া তিনিও কোন উল্লেখযোগ্য কাব্য রচনা করেন নাই। অগ্নিযুগের বিদ্যুৎবহ্নি বা মহাত্মাজীর দাণ্ডিমার্চ তাঁহার কাব্যের খোরাক যোগায় নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড লইয়া তিনি একটা ঐতিহাসিক লিপি রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার জন্যই তিনি সাহিত্যজগতে বিখ্যাত নহেন। তাঁহার পূর্বে সুব্রহ্মণ্য আয়ার অনুরূপ পত্র লিখিয়া উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যজগতে সেজন্য তাঁহার স্থান হয় নাই। সমসাময়িক ঘটনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে কয়টা গান, প্রবন্ধ, আলোচনা বা পত্র লিখিয়াছেন, তাহা কাব্যজগতে তাঁহারও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে। গোরা এবং চার অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অনেকটা স্বদেশী হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহাতে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহা সনাতন বৃন্দাবনী সুর।

"কেন আন বসন্ত নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল।"

এবং এই চিরন্তন সুর লাগিয়াছে বলিয়াই ইহা অমর হইয়া আছে। নীলদর্পণ আজকাল আর কেহ পড়ে না, গোরা চার অধ্যায় কিন্তু চিরকাল সকলে পড়িবে। নীলদর্পণ কেহ না পড়িলেও কাব্যহিসাবে ইহা যে সার্থক সৃষ্টি সে কথা আমি স্বীকার করিতেছি। সমসাময়িক রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা কবির মনে যে কখনও রেখাপাত করে না, এমন কথা আমি ব লতেছি না। আঙ্কল টম'স কেবিন, মাদার, নীলদর্পণ, অরক্ষণীয়া, অমৃতলালের নাটকাবলী, গালিভার্'স ট্রাভেল্স, ভল্টেয়ারের রচনা, জার্নি'স এণ্ড, অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট, ভার্জিন সয়েল আপ্রূটেড, রেন্বো, প্রত্যেকটিই

রসোত্তীর্ণ সার্থক কাব্য এবং রসোত্তীর্ণ কাব্য বলিয়াই অর্থাৎ ওইগুলিতে চিরন্তন মানব-মানবীর শাশ্বত মূর্তি রসের তুলিকায় পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই সাহিত্য-গ্রন্থাগারে উহাদের স্থান আছে—রাজনৈতিক কারণে নহে। যাঁহারা সত্যকার কবি তাঁহারা শাশ্বতের চারণ, সমসাময়িকের নহে। সমসাময়িক ঘটনা প্রায়ই তাঁহাদের কাব্যের বিষয় হয় না, যদি বা হয় তখন তাঁহারা তাহার মধ্যেই শাশ্বতকে প্রত্যক্ষ করেন। সমসাময়িক জনতার পদোৎক্ষিপ্ত ধূলির উর্ধ্বে বিচরণ করিতে পারেন বলিয়াই কবিরা অসাধারণ ব্যক্তি।

কবির কাছে অতি-আধুনিকতার দাবি যাঁহারা করিতে চান, তাঁহারা একটা কথা বিস্মৃত হন যে, কবির চক্ষে 'অতি-আধুনিক' বলিয়া কোন কিছু নাই। মানুষের যে মন লইয়া কবির কারবার, মানুষের সে মন বদলায় নাই। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মহত্ত্ব প্রতিভা ক্ষমা তিতিক্ষা সেকালেও যেমন ছিল, একালেও তেমনই আছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যে প্রগতি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা বস্তুর প্রগতি, মনের প্রগতি নহে। মহাভারত-রামায়ণ-জাতকে মানবচরিত্রের যে বিচিত্র বিকাশ আমরা দেখি, তদপেক্ষা বিচিত্রতর বা নবতর কোন চরিত্র আধুনিকতম কোনও কাব্যে বা ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমাদের মনীষাও যে পূর্বাপেক্ষা বেশি বাড়িয়াছে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। যে বৈজ্ঞানিকগণ আজ নানা অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিয়া শত্রুর প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের প্রতিভা যে গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের প্রতিভা অপেক্ষা বেশি, এমন কথা মনে করিবার কোন হেতু দেখি না। আর্কিমিডিস যে মনীষাবলে রোমবাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনীও প্রাচীন বলিয়া কম বিস্ময়কর নহে। গরুর গাড়িও একদিন মানবসমাজে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। আজ গরুর গাড়ি পুরাতনের পর্যায়ে পড়িয়াছে, এরোপ্লেনও একদিন পড়িবে। যে মানুষ একদা গরুর গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইত, সেই মানুষই আজ এরোপ্লেনে

চড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে উন্নততর প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে, এমন কথা ভাবিবার সঙ্গত কারণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানব-সভ্যতার বহির্বেশের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, মানসিকতা বদলায় নাই। পূর্বে তাহারা গদা লইয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিত, এখন প্লেনে চড়িয়া বম ফেলিয়া যুদ্ধ করিতেছে—তফাত শুধু এইটুকু। এমন কি, যে কমিউনিজ্‌ম্‌কে মানব-সভ্যতার আধুনিকতম প্রকাশ বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন, ইতিহাসের সাক্ষ্য মানিলে তাহারও আধুনিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ঐতিহাসিকদের মতে মুখোশটা শুধু বদলাইয়াছে, অন্তর্নিহিত রূপটা ঠিক আছে। যখনই কোন দেশের দুর্বল জনসাধারণ সবল দ্বারা নিপীড়িত হইতে থাকে, তখনই সেই দেশে কমিউনিজ্‌মের সূত্রপাত হয়। দুর্বলরা সজ্ঘবদ্ধ হইয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করে এবং অবশেষে সেই সজ্ঘবদ্ধ শক্তিবলে সবলকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজেরাই শাসনভার গ্রহণ করে। কিছুকাল তাহারা ন্যায় ও সাম্যের মর্যাদা রক্ষা করিতেও যত্নবান হয়, কিন্তু তাহা কিছুকাল মাত্র। অসাম্য আবার আত্মপ্রকাশ করে—নিপীড়িতদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারাই প্রভুত্ব করিতে থাকেন। এ বিষয়ে বিখ্যাত মার্কিন লেখক উইল ডুরাণ্টের মত উদ্ধৃত করিতেছি—

Communism tends to appear chiefly at the beginning of Civilizations....It flourishes most readily in times of dearth when the common danger of starvation fuses the individual into the group. When abundance comes and danger subsides social cohesion is lessened and individualism increases; communism ends where luxury begins....

বৈজ্ঞানিক, কমিউনিস্ট কাহারও সহিত কবির বিরোধ নাই। মানব-মনের মানব-চরিত্রের মানব-সভ্যতার প্রকাশ হিসাবে তাহা কবি-মানসকে আবিষ্ট করে। অবৈজ্ঞানিক ক্যাপিটালিস্টও করে।

কোন একটা যুগকে দলকে বা 'ইজ্‌ম্'কে অতি-আধুনিক বা অতি-প্রগতিশীল নাম দিয়া তাহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় না। কোনকালেই হয় নাই। কারণ তাঁহারা জানেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্।

যে আমরা এখন আছি সেই আমরা পূর্বেও ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকিব। আধুনিক বা পুরাতন বলিয়া কিছু নাই। কবির চক্ষে সমস্তই চির-পুরাতন এবং চির-নূতন। একমাত্র কবিই সেই সত্যকে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন যাহা—ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। সুতরাং কোন সমসাময়িক ঘটনার উচ্ছ্বাস খবরের কাগজের সম্পাদক অথবা প্রোপাগ্যাণ্ডা-লেখককে যতটা বিচলিত করে, কবিকে ততটা করে না। ইহার জন্য তাহাদের যদি একঘরে করিতে চান করুন, কিন্তু ইহাই তাহাদের স্বভাব।

সমসাময়িক ঘটনা লইয়া না মাতিলেও ভগবানের সৃষ্টি আলো-বাতাস জল-মাটি যেমন জীবনবিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কবির সৃষ্টি কাব্যও তেমনই সভ্য-মানবের চিত্তবিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। কবির কাব্যে চিরন্তন ক্ষুধার সুধা সঞ্চিত থাকে।

তাই মাইকেল মধুসূদন সিপাহীবিদ্রোহ-দুর্ভিক্ষ লইয়া কাব্য না লিখিলেও বাঙালীর মনকে বৃহতের দিকে মহতের দিকে সুন্দরের দিকে উন্মুখ করিয়া গিয়াছেন, ইল্‌বার্ট বিল বা ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টকে কাব্যে স্থান না দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর মনকে দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, বোমা অথবা খদ্দর বিষয়ক কাব্য না লিখিয়াও রবীন্দ্রনাথ জগতের সুধিসমাজকে ভারতবর্ষের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

আমাদের আজ দুর্দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, আমাদের ইতিহাসে আমাদের জাতীয় জীবনে এরূপ দুর্দিন বহুবার আসিয়াছিল এবং আরও বহুবার হয়তো আসিবে। দুর্দিন আসিয়াছে বলিয়াই কি

কবিকে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে? কাব্য-সিংহাসন হইতে বঁধুকে অপসারিত করিয়া কোন বিশেষ ইজ্‌ম্‌কে সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রয়োজন কোনকালেই হয় না।

“টুটলো কত বিজয় তোরণ, লুটলো প্রাসাদচূড়ো
কত রাজার কত গারদ ধূলোয় হ'ল গুঁড়ো।
... ...
ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে, ছিঁড়বে রাঙা পাগ
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।”

আজ নাদিরশাহ তৈমুরলঙ্গ কোথায়? বাগানে কিন্তু জুঁই ফুলের হাসি আজও তেমনই শুভ্র, তেমনই অম্লান। দুর্দিন আসিয়াছে বলিয়া জুঁই ফুল উচ্ছেদ করিয়া পটলের চাষ করিলে আমাদের দুঃখ ঘুচিবে এবং অত্যাচারী জব্দ হইয়া যাইবে, এ কথা আর যে-ই মনে করুক, কবি মনে করিবে না।

এ দুর্দিনে কবির কি তবে কোন কর্তব্য নাই?

আছে বই কি। একমাত্র কর্তব্য তো কবিরই। নিগূঢ়ভাবে সুন্দরভাবে সে তাহা সম্পন্ন করিবে। তাহার কর্তব্য সেই সনাতন প্রাণশক্তিকে আহ্বান করা যাহা যুগে যুগে শিকল ভাঙিয়াছে, যাহা সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়াসে অসাধ্যসাধন করিয়াছে, দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছে, বৃহতের আকর্ষণে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, মহতের পদে আত্মনিবেদন করিয়া আদর্শের জন্য আত্মবলি দিয়াছে।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে, কিন্তু সত্য শিব সুন্দরও চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। সত্য-সন্ধী, শিব-পন্থী সুন্দরের ধ্বজাবাহক সেই যৌবনকে আবাহন করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ *

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন-কাহিনী পৃথিবীর সুধিসমাজে সুবিদিত। তাঁহার জীবনের তথ্যমূলক ঘটনাবলী সকলেই জানেন। কিন্তু এ কথাটা হয়তো অনেকে জানেন না ঐতিহাসিক তথ্যই জীবনের তত্ত্ব নয়, সেগুলি সংবাদমাত্র। সংবাদের নেপথ্যে যে সংঘাত-প্রতিসংঘাত থাকে, যে আবেগ যে প্রতিভা যে প্রেরণা থাকে তাহার রহস্যই জীবন-রহস্য। সামান্য মানুষের জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনও সহজ নহে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো বিরাট জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা আরও দুরূহ। তাঁহাকে অনেকটা চিনিয়াছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ। পরমহংসদেবের পূর্ণ রূপ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন তাহা আমার নাই। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে যতটুকু যেভাবে বুঝিয়াছি তাহাই কেবল আপনাদের নিকট আজ নিবেদন করিব। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একদল অন্ধ একবার একটি হাতী দেখিতে গিয়াছিল। হাতীটিকে ঘিরিয়া হাত দিয়া দিয়া তাহারা হাতীর স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহারা হাতীর পা-টাই স্পর্শ করিল তাহারা বলিল হাতী থামের মতন, যাহারা কানটা স্পর্শ করিল তাহারা বলিল হাতী কুলার মতন, যাহারা শুঁড়টা স্পর্শ করিল তাহাদের ধারণা হইল হাতী সাপের মতন। আমাদের মতো অল্পবুদ্ধি লোকেরা যখন মহাপুরুষ-জীবন আলোচনা করিতে যায় তখন এইরূপ হাস্যকর ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। তবু যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিব, নিজের স্বার্থের জন্যই বলিব, কারণ মহাপুরুষের নামকীর্তনই হয়তো আমার অন্ধত্বমোচন করিয়া দিবে।

---

* কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষ ছিলেন। মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি তাঁহার জীবনে, আচরণে ও উপদেশে বিধৃত হইয়া আছে বলিয়াই আমরা তাঁহাকে অবতার বলি।

মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি? প্রাণি-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষও একপ্রকার পশু। পশু হইলেও তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কি সে বৈশিষ্ট্য? কেহ বলেন মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, কেহ বলেন সে বিবেকী, কাহারও মতে মানুষ সামাজিক। Burke বলিয়াছেন—"Man is an animal that cooks his victuals." Adam Smith মানুষের আরও বৈষয়িক সংজ্ঞা দিয়াছেন—"Man is an animal that makes bargains." কবি বায়রণের ভাষায়—"Man is half dust, half deity, alike unfit to sink or soar, a pendulum betwixt a smile and tear." শেক্‌স্‌পীয়রের ভাষায়—"What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculties!" কিন্তু গীতায় বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায়ে মনুষ্যরূপী শ্রীভগবান এবং দেবীসূক্তে অম্ভৃণ-মহষির কন্যা বাক্ মানুষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানুষ স্রষ্টা। অন্যান্য প্রাণীরাও সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তাহাদের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য নাই। উই পোকা উই ঢিপি ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, যুগযুগান্ত ধরিয়া সে উহাই করিতেছে। এক জাতীয় পাখী এক জাতীয় নীড় নির্মাণ করিতেই দক্ষ। অতি স্থূল আধিভৌতিক দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে মানুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। মানবসভ্যতা স্রষ্টা মানবের কীর্তি নব নব সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। সৃষ্টিই মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, নিত্য নূতন দৃষ্টিতে সে নিজেকে আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতেই তাহার আনন্দ, পুরাতনের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তাহার মনীষা নিত্য নূতন লোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য উন্মুখ, এজন্য যুগে যুগে বহু বিপদকে সে বরণ করিয়াছে—সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে,

পর্বত লঙ্ঘন করিয়াছে, ব্যাধজীবনের অবসান করিয়া কৃষিসভ্যতার পত্তন করিয়াছে, অরণ্য কাটিয়া পল্লী বসাইয়াছে, পল্লীকে নগরে রূপান্তরিত করিয়াছে। সৃষ্টি করিয়াছে নবতর সৃষ্টির প্রেরণায়। বিশ্বপ্রকৃতির মতো তাহার প্রকৃতিও যেন সতত সংগ্রামশীল। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন—

"তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণ-রঙ্গ-ভূমি
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের বিজয়বার্তা"

তাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সম্বন্ধেও সমান সত্য।

মানব পশু বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহী পশু। প্রকৃতির প্রতিভাবান দুরন্ত অশান্ত সন্তান সে। প্রকৃতির কোনও শাসনকেই সে মানিয়া লয় নাই। সে রাত্রের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়াছে, দিবসের প্রখর আলোকে রুদ্ধঘরে বসিয়া কৃত্রিম অন্ধকার উপভোগ করিয়াছে। আহারে নিদ্রায় প্রজননে প্রকৃতির কোনও বিধান, কোন সীমা, কোন গণ্ডীকে সে মানে নাই। ইহার জন্য শাস্তিভোগ করিয়াছে তবু মানে নাই। নানাবিধ আবিষ্কারের সাহায্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে দূর করার প্রচেষ্টাই যেন তাহার সভ্যতার পরিচয়। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, বেতার, বিমানপোত, টেলিভিশন, পুস্তক, মুদ্রাযন্ত্র, বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কারে তাহাকে নিত্য নূতন দেশে লইয়া চলিয়াছে। নব নব সৃষ্টিতে সে নিজেকেই যেন অতিক্রম করিতে চাহিতেছে। পথ দুর্গম, কিন্তু তবু সে আনন্দিত। এই আনন্দের প্রেরণাই তাহার পাথেয়। নিত্য নব আনন্দের সন্ধানে বস্তুজগতে নিত্য নব আবিষ্কার করিতে করিতে মানুষ অবশেষে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করিল যাহা তাহার সমস্ত পূর্ব-আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিল, যাহার নিকট সমস্ত বস্তু-মহিমা তুচ্ছ হইয়া গেল। এতকাল যে পশু-মানব আহার-নিদ্রাদির বৈচিত্র্যসাধনে তৎপর ছিল

সহসা সে আত্ম-আবিষ্কার করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-আলেয়াকে অনুসরণ করিতে করিতে মানবের সৃষ্টিপ্রতিভা যখন তমসাচ্ছন্ন লোকে বিভ্রান্ত তখন সহসা ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ", ধ্বনিত হইল যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা—নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্, তাহা—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, তাহা—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। সুখের সন্ধানেই তাহার যাত্রা শুরু হইয়াছিল, সহসা সে আবিষ্কার করিল—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। এই আত্মআবিষ্কার এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানব-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অধ্যাত্মজগতের নূতন আলোকে তাহার আধিভৌতিক জগৎ স্বপ্নের মতো অলীক হইয়া গেল। তাহার মনে নূতন চিন্তা জাগিল কি শ্রেয় এবং কি প্রেয় এবং এই চিন্তাধারা তাহার প্রগতির রূপ পরিবর্তন করিয়া দিল। উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।"

শ্রেয় এবং প্রেয়—ধর্মবুদ্ধি এবং বিষয়বুদ্ধি—সম্মিলিত ভাবে প্রত্যেক মানুষকেই আশ্রয় করে। বুদ্ধিমান লোক শ্রেয়কে এবং অল্পবুদ্ধি লোক প্রেয়কে বরণ করিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য অল্পবুদ্ধি লোকের সংখ্যাই পৃথিবীতে চিরকাল বেশি। বস্তুজগতে প্রাধান্যলাভ করিবার জন্য অধিকাংশ মানুষ তখনও যুদ্ধ করিত, এখনও করিতেছে। বন্যমানবের নখদন্ত সভ্যমানবের নানা অস্ত্রশস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। পৌরাণিক যুগের অসি, গদা, মুষল, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, তোমর, অঙ্কুশ, ক্ষুরপ্র, নারাচ, পরশু, পট্টিশ, ভল্ল, চক্র, লাঙ্গল, ভুশুণ্ডী, চর্ম প্রভৃতি বর্তমানে গুলি গোলা বন্দুক

কামান শ্র্যাপ্‌নেল, আণবিক বোমা, উদ্‌বোমায় পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ মানুষই জীবনটাকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারবিন জীবনযাত্রার নামকরণই করিয়াছেন struggle for existence. আমাদের পুরাণের গল্পের অধিকাংশ গল্পও যুদ্ধের গল্প। দেব-অসুর, রাম-রাবণ, কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের চণ্ডী রণরঙ্গিণী, আমাদের দেবতারা কেহ ত্রিপুরারি, কেহ কংসারি, কেহ বৃত্রনিসূদন! শুধু আমাদের পুরাণেই নয়, মিশরীয় পুরাণের রা এবং আইসিসের গল্প, ব্যাবিলনের ইয়া এবং তিয়াম্মতের কাহিনী, প্রাগৈতিহাসিক আমেরিকার ওবেলিথের গল্প, সবই দ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের ইতিহাস, অল্পবুদ্ধি প্রেয়কামী মানব-মানসের প্রতিচ্ছবি। আমাদের আধুনিক ইতিহাসও তাই। ব্যক্তির বা জাতির অতি স্থূল বৈষয়িক জয়-পরাজয়ই তাহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রেয়কামীর সংখ্যা এখনও অল্প। অধিকাংশ মানবই প্রেয়কামী একথা সত্য, কিন্তু একথাও সত্য সমস্ত মানবজাতি ওই মুষ্টিমেয় শ্রেয়কামী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভাবান মানুষদের দিকেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে—যাহারা জীবনকে 'যুদ্ধ' না বলিয়া 'লীলা' বলিয়াছেন। মাঝে মাঝে ইঁহাদের পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা যে করা হয় নাই তাহা নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজের অন্তরোৎসারিত শ্রদ্ধা ইঁহাদেরই চরণে সমর্পিত হইয়াছে। ঘৃণ্যতম ভোগীও অবশেষে ত্যাগীর চরণেই শির অবনত করিয়াছে।

অধিকাংশ মানুষই লুণ্ঠনকারী দস্যু, কিন্তু মনে হয় সেজন্য তাহারা যেন মনে মনে লজ্জিত, তাই লুণ্ঠন করিবার সময় তাহারা ধর্মের মুখোশ পরিয়া লুণ্ঠন করে। এই ভণ্ডামি দেখিয়া আমরা অনেক সময় ক্ষুব্ধ হই বটে, কিন্তু ক্ষুব্ধ হইবার প্রয়োজন নাই, ওটা সুলক্ষণ, ওই মুখোশের দ্বারাই তাহারা বাঁকা পথে সত্য শিব সুন্দরকে অভিনন্দন করিতেছে।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥"

এই মহাবাণীর নিগূঢ় সত্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে।

ইহারা সংখ্যায় বেশি বলিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। ধূলিকণা অসংখ্য, কিন্তু সূর্য এক। সেই একটি সূর্যের ভাস্বরতায় অসংখ্য ধূলিকণা তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। বস্তুজগতে বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার যেমন পূর্বতন আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিয়াছে—বিমান-পোতের নিকট গরুর গাড়ি আজ যেমন অকিঞ্চিৎকর, হাইড্রোজেন বোমার কাছে বন্দুক যেমন হাস্যকর—মানবজাতির অগ্রগতিতে অধ্যাত্ম-জগতের আবিষ্কারের কাছে আধিভৌতিক জগতের ঐশ্বর্য আজ তেমনি হীনপ্রভ। শ্রেষ্ঠ মানবমনীষা আর অনিত্য বস্তুতে নিবদ্ধ নাই, নিত্যবস্তুর সন্ধানে সে উৎসুক। তাহাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে নয়, আসক্তি-বন্ধনের বিরুদ্ধে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গুণাতীত হইতে চান—

"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥"

যাঁহার কাছে সুখদুঃখ সমান, যিনি আত্মস্থ, যাঁহার কাছে মাটি পাথর সোনা তুল্যমূল্য, প্রিয়-অপ্রিয়, মান-অপমান, শত্রুমিত্র, স্তুতিনিন্দা যাঁহার দৃষ্টিতে সমান, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী নন—তিনিই গুণাতীত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতেই সমুৎসুক। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু তথাপি তাঁহাদেরই সাধনা

সংখ্যাগরিষ্ঠ পশুর দলকে ধীরে ধীরে পশুত্বের স্তর হইতে মুক্ত করিতেছে। অধ্যাত্মজগতে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই জয়ী নয়।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয় যে পশুমানবের মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হইল কি প্রকারে? তাহার উত্তর মৃত্যু এবং মানবমনের অন্তহীন কৌতূহল। সে চিরকালই প্রকৃতিকে জানিতে চাহিয়াছে, বুঝিতে চাহিয়াছে, তাহার অমোঘ বিধানকে অতিক্রম করিবার সাধনা করিয়াছে। এজন্য তাহার কৌশল ও তপস্যার অন্ত নাই। এই পথেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে যাহা কিছু বস্তুসংশ্লিষ্ট তাহাই ক্ষণভঙ্গুর। জীবন, যৌবন, পুত্র, কলত্র, মান, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার পরিণাম সমস্তই কালক্রমে বিনষ্ট হয়। এ সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যক্ষ মৃত্যুই মানবের প্রথম ধর্মগুরু। তাই বোধ হয় কঠোপনিষদের ঋষি মানবসন্তান নচিকেতাকে যমের সম্মুখীন করিয়া যমের মুখ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মৃত্যুই—এই অনিত্য-বিধ্বংসী মহাকালই—শেষে তাহার নিকট দেবতা-রূপ ধারণ করিয়াছে। পুরুষরূপে যিনি মহাকাল, স্ত্রীরূপে তিনিই মহাকালী। নানারূপে নানা মূর্তিতে নানা প্রতিমায় মহাকাল ও মহাকালীর পূজা মানবসমাজে প্রচলিত। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শুভঙ্কর রূপও তাহার নিকট ক্রমশঃ প্রতিভাত হইয়াছে। মৃত্যুই যে নবজীবনের সূচনা করে, ধ্বংসের মধ্যেই যে নবসৃষ্টির বীজ নিহিত আছে এ সত্য মানবকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। ধ্বংসকর্তা মহেশ্বরের সহিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং পালনকর্তা বিষ্ণুও তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। মহাকালীর হস্তে কেবল খড়্গ এবং ছিন্নমুণ্ডই নাই, বরাভয়ও আছে।

এই পথেই—জীবনের সমস্ত কিছু নশ্বর এই উপলব্ধির ফলস্বরূপই—সে আর একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছে—ভালবাসা। যাহা থাকিবে না, একটু পরেই চলিয়া যাইবে তাহাকে ঘিরিয়া যে মোহ যে মায়া তাহাই ভালবাসার আদি রূপ, তাহাই পরিশুদ্ধ হইয়া বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছে। পরমহংসদেবের বিচিত্র

অধ্যাত্মজীবনের দিগ্‌দর্শনও এই দুইটি জিনিস—মহাকালী এবং প্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্মজগতের একজন দিকপাল। বস্তু-জগতের দিকপালেরা যেমন বিশিষ্ট প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের কীর্তিকলাপ যেমন সৃষ্টিধর্মী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তেমনি বিশেষ একটি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিক কীর্তিকলাপ তেমনি সৃষ্টিধর্মী। প্রথম জীবনে তাঁহার যে রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহা কবি ও ভক্তের রূপ। তাঁহার কবিকল্পনা ও ভক্তি, তাঁহার সৌন্দর্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যয় তাঁহাকে অনন্য করিয়াছে। তাঁহার যদি কেবলমাত্র কবি-কল্পনা থাকিত তাহা হইলে তিনি আর পাঁচজন সাধারণ কবির মতো কবিতাই রচনা করিতেন, আমরা সাধক রামকৃষ্ণকে পাইতাম না। তিনি যদি কেবলমাত্র ভক্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা একজন সাধক পাইতাম বটে কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র কবি রামকৃষ্ণকে পাইতাম না।

যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে!"

সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাল্যকাল হইতেই তিনি রোমাঞ্চিত হইয়া ভাবিয়াছেন—এই কি তিনি, এই কি তিনি! তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষও করিয়াছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের পল্লবগ্রাহীরা হয়তো ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না। অনেকে তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাই তো প্রত্যাশিত। শফরীরা গণ্ডূষমাত্র জলেই তো ফরফর করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে কেবল বুদ্ধিপ্রভাবেই বুঝি বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়। এ যুগের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dr. Alexis Carrel কিন্তু বলিতেছেন—

"Intelligence alone is not capable of engendering science." তিনি আরও বলিতেছেন—"Certainty derived from science is very different from that derived from faith. The latter is more profound."

এই profound (গভীর) বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে profound দৃষ্টিভঙ্গীও প্রয়োজন। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তরে কৃষ্ণমেঘের পটভূমিকায় সাদা বকের সারি যে বালককে অভিভূত করিয়াছিল, যাত্রার শিব সাজিয়া শৈশবেই যিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের কালীপ্রতিমার স্পর্শমাত্র যাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল, ম্যাডোনার ছবি দেখিয়া যিনি যিশুখৃষ্ট-মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, পাষাণ-প্রতিমাকে সজীব দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় যিনি আহার নিদ্রা বস্ত্র উপবীত সমস্ত ত্যাগ করিয়া মাতৃহারা শিশুর ন্যায় অশ্রুপাত করিতে করিতে দিনের পর দিন কাটাইয়াছিলেন, অবশেষে যাঁহার অদর্শনে অধীর হইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যিনি কালী দুর্গা শিব সীতা রাম হনুমানকে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রেষ্ঠ ভক্তের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভক্ত কবি-মানসের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অবিশ্বাসীর নাই। যাহা অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় তাহা খালি চোখে দেখা যেমন সম্ভব নহে, বেরসিক ব্যক্তি যেমন কাব্যরস উপভোগ করিতে পারে না, অবিশ্বাসীর পক্ষেও তেমনি ভক্তের মর্মোদ্ভেদ করা অসম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার এই যে তাঁহার কবিমানসের কল্পনা ভক্তহৃদয়ের আকুলতায় বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার মানসদেবতাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। এই অসাধ্যসাধন করিবার জন্য তিনি কোথাও যান নাই, কোন শাস্ত্রচর্চা করেন নাই, কাহারও নিকট উপদেশভিক্ষা

করেন নাই। তাঁহার কবিমানস অগাধ বিশ্বাস লইয়া যাহাই কল্পনা করিয়াছে তাহাই সফল হইয়াছে। Plato-র Utopian স্বপ্ন সফল হয় নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুধু জড় প্রতিমাই সজীব হইয়া ওঠে নাই, তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে সাধনমার্গের সুকঠিন দুর্গম পথ অতি সহজে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সবিকল্প সমাধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার গুরুরা স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ শিষ্যই গুরুর সন্ধান করে, কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতই ঘটিয়াছে—প্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে তোতাপুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং নিজেদের তাগিদেই যেন তাঁহাকে সাধনমার্গে আগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভৈরবী আসিয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি তোমাকেই খুঁজিতেছি। প্রত্যাদেশ পাইয়া আমি তোমারই কাছে আসিয়াছি।'

শুধু যে তাঁহার গুরুরা আসিয়াছিলেন তাহাই নয়, বাঙলাদেশের তদানীন্তন মনীষিবৃন্দ—গৌরী পণ্ডিত, পদ্মলোচন, বৈষ্ণবচরণ, শশধর তর্কচূড়ামণি, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নাগ মহাশয়, তখনকার ইয়ং বেঙ্গলের দল, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ—দলে দলে সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ ও তাঁহার অনাগত শিষ্যদের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কেবল ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন—ছাদের উপর উঠিয়া তাহাদের ডাক দিতেন—"ওরে কোথায় তোরা, আয়, আমি যে আর তোদের ছেড়ে থাকতে পাচ্ছি না।" তাঁহারা একে একে আসিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী দেশে দেশান্তরে ছড়াইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোথাও যান নাই। তাঁহার কল্পনা, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সাধনা লইয়া অটল হিমাদ্রির মতো একস্থানেই তিনি বসিয়া ছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুগচেতনার মর্মমূলে আজও বোধ হয় আছেন এবং

ভবিষ্যতে নূতন যুগের নূতন আলোকে নূতন পৃথিবীতে যে নূতন ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে তাহার প্রাণকেন্দ্রেও তিনি তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিবেন।

এই ধর্মরাজ্য-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হইতেছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অনেকেই বলেন—পাপে তো পৃথিবী ভরিয়া গেল, পাপীরাই তো বিজয়পতাকা উড়াইয়া সদম্ভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সাধুদের কষ্টের অবধি নাই, পরিত্রাতা ভগবান কবে, কি ভাবে, কোথায় আসিয়া ধর্ম-স্থাপন করিবেন ?

ভারতের ঋষি বলিয়াছেন—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। ভগবান কখন কি ভাবে আসিয়া যে ধর্মসংস্থাপন করিবেন, প্রতি মুহূর্তেই তাঁহার সে প্রয়াস চলিতেছে কি না, তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা সহজ নহে। সর্বযুগেই যে তিনি শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণরূপেই জন্মগ্রহণ করিবেন এমন না-ও হইতে পারে। তিনি যে নিশ্চিন্ত নাই তাহার কিছু আভাস আমাদের ইতিহাসেই আছে। ভারতে যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কিংবা তাহার সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছে, তখনই একজন করিয়া মহাপুরুষ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যদিও শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের হুবহু নকল নন কিন্তু উক্ত দুই অবতারের বাণী এবং আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিক ধর্মের অধঃপতনে সমস্ত আর্যাবর্ত যখন কর্মকাণ্ডের প্রাণহীন নিষ্ঠুরতায় কাতর, তখন প্রথমে মহাবীর, তাহার পর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও যখন কালক্রমে গ্লানিপূর্ণ হইয়া উঠিল তখন ধর্মজগতে জন্মগ্রহণ করিলেন শঙ্করাচার্য এবং রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করিলেন মুসলমান। অধঃপতিত বৌদ্ধেরা অনেকেই

মুসলমান হইতেছিল, সুলতান মাহমুদ যখন ভারত লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছেন তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রামানুজ। তাহার পর বাঙলাদেশে পাঠানদের হিন্দুবিদ্বেষ যখন চরমে উঠিয়াছে তখন নিষ্ঠুর হিন্দুবিদ্বেষী সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে বাঙলার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন চৈতন্য এবং পাঞ্জাবের মাটিতে নানক। তাহার পর প্রায় তিন শত বৎসর অন্ধকার। মোগলযুগই ভারতবর্ষের ধর্মজগতে অন্ধকারময় যুগ। তবু এই অন্ধকারময় যুগের শেষভাগেও যখন ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম বিপন্ন, তখন যে বীরের কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল তিনি রামভক্ত রামদাসের শিষ্য শিবাজী। তাহার পর আসিলেন ইংরেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ যখন বাংলাদেশে শাসনের নামে যথেচ্ছাচারিতা করিতেছেন তখন ভারতবর্ষের যে আত্মচেতনা ভবিষ্যতে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটাইবে সেই শক্তির প্রথম উদ্বোধক রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে। ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের যখন ফাঁসি হয় তখন রামমোহন চারি বৎসরের শিশু। তাহার পর ইংরেজের হস্তে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে ভারতের শেষ হিন্দুশক্তি যখন বিধ্বস্ত হইতেছে তখন ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে—জন্মগ্রহণ করিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাঙলাদেশে নব্য হিন্দুধর্মের প্রথম উদ্‌গাতা, এবং তাহার কিছুদিন পরেই—১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে—দয়ানন্দ সরস্বতী, আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মোহ এবং নূতন ধরনের পাশ্চাত্ত্য গোঁড়ামির বিষ আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া আমাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে সেই ইংরেজী ভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য হয় ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে। যাঁহার জীবন ভবিষ্যতে সকল প্রকার মোহ ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করিবে সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিলেন ঠিক তাহার এক বৎসর পরে—১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে। তাহার দুই বৎসর পরেই জন্মিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি। দশ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ—সেই মন্ত্রের

প্রথম উদ্গাতা। ইহার কিছুকাল পরে—১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ—ইংরেজ ঐতিহাসিক যাহার নাম দিয়াছেন 'সিপাহী-বিদ্রোহ'। সে যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিতে পারি নাই, ভারতসন্তানের রক্তেই সেদিন ভারতভূমি সিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে রক্ত শুকাইতে না শুকাইতেই যে কয়জন ভারতসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন তাঁহাদের প্রয়াস বিফল হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে বিবেকানন্দ, ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে মহাত্মা গান্ধী, ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে একটা কথা স্বতঃই মনে হয় যে শ্রীভগবান নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু সমস্ত সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিতে শ্রীরামচন্দ্রও পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণও পারেন নাই—দুই-একটা রাবণ কংস জরাসন্ধ দুর্যোধন বিনষ্ট হইয়াছে মাত্র। এত বড় বিরাট একটা কাজ—পাপের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং পুণ্যের সার্বভৌম প্রবর্তন—সহজে অল্প সময়ে হয় না। বহু কল্প প্রয়োজন। পৃথিবী এককালে জলময় ছিল—বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে স্থলের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মরাজ্যও একদিন সংস্থাপিত হইবে; নিগূঢ় অন্তরালে তাহার আয়োজন চলিতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাবেই কি তাহার ইঙ্গিত নাই? যে মানব একদিন বর্বর বন্য পশু ছিল তাহাদেরই মধ্যে এমন লোক কেন জন্মিল যাঁহার চরিত্রে শঙ্করের প্রতিভা, বুদ্ধের অহিংসা, যীশুখ্রীষ্টের ক্ষমা, ইসলামের মহত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যের প্রেম একই সঙ্গে বিরাজমান, যিনি ভয়ঙ্করী কালীপ্রতিমার মধ্যে শুধু করুণাময়ী জননীকেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, 'শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' ব্রহ্মকে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কোনও ধর্মের সহিত কোনও ধর্মের বিরোধ নাই, যাঁহার দৃষ্টিতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ একই তত্ত্বের বিভিন্ন স্তরমাত্র, যিনি জানিয়া-

ছিলেন কিছুর সহিতই কোনও কিছুর মূলতঃ প্রভেদ নাই—কারণ সমস্ত কিছুই সেই বিরাট উর্ধ্বমূল নিম্নশাখ ক্ষণস্থায়ী অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা মাত্র—সমস্ত কিছুরই মূল উর্ধ্বে শাশ্বত ব্রহ্মে। এরূপ লোকের মানবসমাজে আবির্ভাবের কি কোনও অর্থ নাই?

অর্থ যে আছে তাহা আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বকে যে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন সেই সমন্বয়ের সুর যেন আজ পৃথিবীর মানসক্ষেত্রে ধ্বনিত হইতে শুরু করিয়াছে। হয়তো ক্ষীণভাবে, কিন্তু শুরু যে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিকদের যেন নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের চক্ষে জড় ও জীবের সীমারেখা আজ অস্পষ্ট। বিভিন্ন বস্তুর বৈষম্যের যে কারণ আজ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহাও সমন্বয়ধর্মী, সমস্ত বস্তুরই বাহিরের স্থূলরূপ যে পরমাণু-নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তিকণার নানাবিধ সমাবেশ ও স্পন্দনের উপরই নির্ভরশীল একথা আজ তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইতেছে। স্বর্ণ ও লৌহের বৈষম্য আপাতবৈষম্য—আসলে তাহারা ইলেক্ট্রন-প্রোটনের বিভিন্ন লীলামাত্র একথা আজ সর্বস্বীকৃত সত্য।

রাজনৈতিক জগতেও আজ এই সমন্বয়দৃষ্টি দেখা দিয়াছে। সর্বদেশের মনীষীরাই আজ সমন্বয়ের আলোকে রাজনীতির জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চাহিতেছেন। বস্তুতান্ত্রিক আমেরিকার Wendel Wilkie তৎপ্রণীত *One World* পুস্তকে বলিয়াছেন—পৃথিবীর মানসিক ভারকেন্দ্র ধীরে ধীরে স্থান-পরিবর্তন করিতেছে। Aldous Huxley এবং Maugham-রা বেদান্ত-উপনিষদের বাণীতে মুগ্ধ হইয়াছেন, রমঁ্যা রলঁ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজীবনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন। হাওয়া বদলাইতেছে সন্দেহ নাই। League of Nations অথবা United Nations-এর ব্যর্থতায় হতাশ হইলে চলিবে না, হয়তো আরও দুই-একটা মহাযুদ্ধ আমাদের বিভ্রান্ত

করিবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলনের পথ মিলিবেই। মানুষকে শান্তির পথ, মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ সেই পথ-প্রস্তুতির আয়োজন করিয়া গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অন্যতম।

আজ আমরা নিকটে আছি বলিয়া তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আমাদের পরবর্তীরা সুদূর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিরাট হিমালয়ের অভ্রভেদী বিরাটরূপ দেখিতে পাইবে। সম্রাট অশোকের সমসাময়িক ব্যক্তিরা অশোককে চিনিতে পারেন নাই, আজ আমরা অশোককে চিনিয়াছি।

আজ আমাদের ঘোর দুর্দিন সন্দেহ নাই। দুঃখের কারণ শুধু বাহিরেই নাই, আমাদের ভিতরেও আছে। যে ধর্ম ভারতের প্রাণ-স্বরূপ আজ আমরা সেই ধর্মচ্যুত হইয়াছি। আমাদের মনের সমস্ত ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে রাজনীতির উপর—যে রাজনীতির মূল লক্ষ্য স্বার্থপরতা। আমরা সকলেই ক্রমশঃ স্বার্থপর পশু হইয়া পড়িতেছি। পাশব শক্তির আপাত-উন্নতি আমাদের সকলকেই পশুত্বের স্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ। আমরা বিপদে পড়িলে আজকাল ভগবানের কাছে আর প্রার্থনা করি না, সভায় বা সংবাদপত্রে আন্দোলন করি। দুর্দিন পুরাকালেও বহুবার আসিয়াছিল। তখন আর্ত মানব ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। কংসের অত্যাচারে যখন সকলে সন্ত্রস্ত তখন আর্ত মানবমানবী যে প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা নিষ্ফল হয় নাই। আসুন আমাদের এই দুর্দিনে পুরাণকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি—

"হে দেবতা, জাগ্রত হও। বিভীষিকাময়ী রজনী সমুপস্থিত। অবিশ্রান্ত বারিপাতে কর্দম-পিচ্ছিল পথ; মুহুর্মুহু বিদ্যুতে ও মেঘ-গর্জনে আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে মনে হইতেছে যেন প্রিয়পরিজনের কাঁচা মাংস ও তপ্তরক্তের উপর দিয়া চলিতেছি। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া আছে। সকলেরই

নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হইতেছে, যেন আর কেহ নাই। অন্ধকারে আমারই মতো আর যাহারা চলিতেছে তাহাদের সহিত মুখামুখি হইলেই হিংস্র পশুর মতো পরস্পর চাহিয়া দেখিতেছি, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার বাসনা, অথচ যেন পরস্পরকে হনন না করিয়া চলিবার উপায় নাই। রাক্ষস কংসের অনুচরেরা অন্ধকারে পাগলের মতো ঘুরিতেছে, তাহাদের চোখেও ঘুম নাই। আমরা তাহাদের বন্দী, আমাদের লাঞ্ছনার সীমা নাই। তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিতেছি না। রুদ্ধনিশ্বাসে ভীত শঙ্কিত প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি—হে দেবতা, জাগ্রত হও। পাপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; জননীর বক্ষে স্তন্য নাই, ক্ষুধিত শিশুরা ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতেছে। অসহায়া নারীদের আর্তনাদে কর্ণ বধির হইয়া গেল। এত আঘাত সহ্য করিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি। তোমার প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ হইতে বসিয়াছে। শাসনে পীড়নে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে। হে অন্ধকারের দেবতা, হে কৃষ্ণ, তুমি জাগ্রত হও।”

তাঁহাদের প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই। আমরাও যদি তেমনি করিয়া প্রার্থনা করি ভগবান আবার আবির্ভূত হইবেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পুণ্য-জীবন আলোচনা করিয়া এই শিক্ষাই যেন আমরা লাভ করি।

বুদ্ধদেবের জীবনে নারী *

ধর্মজগতের মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে একটি কৌতুকজনক ব্যাপার প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহাদের অনেকেই নারীসঙ্গ পরিহার করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু নারীরা কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। ঘটনাচক্রে পাকে-প্রকারে তাঁহাদের জীবনে নারীর ছায়া অনিবার্যভাবে পড়িয়াছে। ইহার বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

যিশুখ্রীষ্ট—মেরী মডলিন, প্যাপ্‌নুশিয়াস—থেয়া, এবলার্ড—হেলাইস্ প্রভৃতির কাহিনী সুপরিচিত। এদেশে চৈতন্যদেব তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবীদের এবং বন্ধুপত্নীদের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বিবাহিত পত্নীর সহিত আজীবন বাস করিয়াছেন, একজন ভৈরবীর নিকট তাঁহাকে বহুদিন ধরিয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষাও লাভ করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার আরাধ্য দেবতাও ছিলেন নারী—মহাকালী।

আজন্মব্রহ্মচারী স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নে হয়তো প্রবেশাধিকারই পাইতেন না যদি একজন মহিলা তাঁহাকে প্রফেসার রাইটের সহিত পরিচয় করাইয়া না দিতেন। প্রফেসার রাইটের সুপারিশ পত্র পাইয়াও তাঁহার সুবিধা হয় নাই—শিকাগো শহরের রাস্তায় রাস্তায় তিনি বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন আর একজন মহিলা Mrs. G. W. Hale তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পার্লামেণ্টে লইয়া যান। এই দুইজন নারীর সাহায্য না পাইলে নারীসঙ্গ-বিরোধী বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় হয়তো সম্ভবপরই হইত না। ইহারা ছাড়াও স্বামীজীর জীবনে আরও

* ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বুদ্ধপূর্ণিমা-সম্মেলন সভায় পঠিত।

অনেক নারী আসিয়াছিলেন। Miss Macleod, Mrs. Ole Bull, Sister Nivedita প্রভৃতির নাম বিবেকানন্দের নামের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

ভগবান বুদ্ধের জীবনেও নানা সময়ে নানা বেশে নারী-সমাগম হইয়াছিল—বর্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভগবান বুদ্ধ আজন্মব্রহ্মচারী ছিলেন না। তাঁহার বাল্যকাল ও যৌবনের অধিকাংশ সময় বিলাসেই অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে তিনটি বাড়ি তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। একটি গ্রীষ্মকালের জন্য, একটি বর্ষাকালের জন্য এবং একটি শীতকালের জন্য। এইসব বাড়িতে তিনি একা থাকিতেন না, নৃত্যগীতবাদ্যরতা সুন্দরী কামিনীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। বর্ষাকালে দোতলা হইতে নামিতেনই না—এ সকল কথা বুদ্ধ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

ষোল বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি নিজেই একটি রূপসী নানা সদ্‌গুণভূষিতা শাক্যকুমারীকে নির্বাচন করিয়া বিবাহ করেন। পালি শাস্ত্রে "রাহুলমাতা" নামে এই মহিলার উল্লেখ আছে। সংস্কৃত, তিব্বতী, সিংহলী প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে কিন্তু সিদ্ধার্থের পত্নীর অনেক নাম পাওয়া যায়—গোপা, যশোধরা, উৎপলবর্ণা, ভদ্রা, বিম্বা ইত্যাদি। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে তাঁহার একাধিক পত্নী ছিল, কারণ সেকালে একাধিক বিবাহ করাই সামাজিক নিয়ম ছিল, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে। তাঁহার একাধিক পত্নী ছিল কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে একাধিক নারীর সংস্রবে আসিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সিদ্ধার্থকে বিলাসে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য শুদ্ধোদনের অনেক সুন্দরী কামিনী নিয়োগের কথা অনেক গ্রন্থে আছে। কৃশা গৌতমী নামে একজন তন্বী শাক্যযুবতী সিদ্ধার্থের রূপের প্রশংসা করেন। ইহাতে সিদ্ধার্থ তাঁহাকে নিজের গলার মুক্তাহার খুলিয়া উপহার দিয়াছিলেন। ইহার অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

অনেকে করিয়াছেন—কিন্তু ইহাকে সাধারণ মানবোচিত দৌর্বল্য বলিয়া স্বীকার করিলেও বুদ্ধমহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি তো সাধারণ রাজপুত্রের জীবনই যাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি গৃহত্যাগ করেন।

গভীর রাত্রে নিদ্রিতা নর্তকীদের স্রস্ত বসন, আলুথালু কেশপাশ, বিসদৃশ অঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতি নাকি তাঁহার মনে ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল। রমণীদের প্রতি বিতৃষ্ণার এই প্রথম বর্ণনা তাঁহার জীবনচরিতে পাওয়া যায়।

গৃহত্যাগের পূর্বে শিশুপুত্রকে তাঁহার একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। সন্তর্পণে পত্নীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পত্নীর বাহুতে শিশুর মুখ ঢাকা। বাহু সরাইতে গিয়া পাছে পত্নী জাগ্রত হইয়া গমনে বাধা দেন এই ভয়ে তিনি পত্নীকে আর জাগান নাই, নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। প্রথমে গয়ার নিকটবর্তী এক পাহাড়ে এবং পরে নৈরঞ্জনা তীরে উরুবিল্ব নামক এক গ্রামে। তাঁহার তপস্বি-জীবনের প্রথমভাগে রক্তমাংসময়ী কোন রমণীর আবির্ভাবের কথা কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। মায়াময়ী "মার" অবশ্য নানা বেশে আসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সফল যে হয় নাই তাহার প্রমাণ তিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তপস্বি-জীবনের শেষভাগে বুদ্ধত্বলাভের অব্যবহিত পূর্বে—নিদারুণ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া যখন তিনি মৃতপ্রায় তখন তাঁহার জীবনে একটি করুণাময়ী রমণীর আবির্ভাব দেখিতে পাই —গোপকন্যা সুজাতা। সুজাতা-হস্তের পায়সান্ন তাঁহার তপস্যাশীর্ণ দেহে বলসঞ্চার করিয়াছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে এই সরলা গ্রাম্য নারীর বহু যশ কীর্তিত হইয়াছে।

ইহার পর তিনি বোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হইলেন এবং সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক

ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি এই আর্য-আষ্টাঙ্গিক মার্গ জনসমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রচার-জীবনে তিনি ঋষিপত্তনে আসিয়া প্রথম বর্ষাযাপন (বস্‌সো) করিয়াছিলেন। সেকালে সন্ন্যাসীরা সারা বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু বর্ষার কয় মাস কোথাও যাইতে পারিতেন না, পথঘাট জলে কাদায় দুর্গম হইয়া পড়িত বলিয়া তাঁহারা একস্থানে বাস করিতেন। বর্ষার পর বুদ্ধ যখন ঋষিপত্তন হইতে উরুবিল্বের দিকে যাত্রা করিয়াছেন সেই সময়কার একটি ঘটনা হইতে নারীদের সম্বন্ধে বুদ্ধের তদানীন্তন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একটি বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কয়েকটি যুবা কয়েকটি স্ত্রীলোকসহ আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছে। তাহাদের মধ্যে একজন বারাঙ্গনাও ছিল। একটু পরে বারাঙ্গনাটি তাহাদের জিনিসপত্র চুরি করিয়া পলাইয়া গেল। যুবকরা তাহাকে খুঁজিতে লাগিল। বুদ্ধদেবকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তিনি কোন স্ত্রীলোককে যাইতে দেখিয়াছেন কি না। বুদ্ধ প্রশ্ন করিলেন—স্ত্রীলোকে তাহাদের কি প্রয়োজন? তাহারা চুরির ব্যাপার জানাইলে তিনি তাহাদের বলিলেন—আচ্ছা, কি ভাল বল দেখি, স্ত্রীলোকদের খোঁজ করা, না নিজেদের খোঁজ করা?

আত্মানুসন্ধানের পথে স্ত্রীলোকেরা যে বিঘ্নস্বরূপ ইহাই তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকদের তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারেন নাই।

অল্প কিছুদিন পরেই স্বদেশে ফিরিয়া দুইটি স্ত্রীলোকের কাণ্ড দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি যখন কপিলাবাস্তুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন—যেখানে একদা রাজপুত্র ছিলেন, সেখানে ভিক্ষুকবেশে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে যখন পিতৃভবনের সম্মুখে সমাগত হইলেন তখন রাজা শুদ্ধোদন, পাত্র, মিত্র, অমাত্য,

প্রজাবর্গ সকলে ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—কিন্তু আর একজনও আসিলেন যাঁহাকে বুদ্ধদেব এই জনতার মধ্যে দেখিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করেন নাই—তাঁহার পালিকা মাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী। রাণীর সমস্ত মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া আলুলায়িত বেশে দীর্ঘ আট বৎসর পরে গৃহ-প্রত্যাগত সন্ন্যাসী পুত্রকে দেখিবার জন্য বহির্ভবনে ছুটিয়া আসিয়াছেন স্বয়ং মহাপ্রজাবতী!

বুদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—আত্মীয়স্বজন প্রিয়পরিজন দলে দলে সকলে আসিল : কেহ প্রণাম করিল, কেহ চুম্বন করিল, কেহ আলিঙ্গন করিল—সকলেই আসিল—আসিল না কেবল একজন—তিনি তাঁহার পত্নী রাহুলমাতা। তিনি নিজের ঘরে বসিয়া রহিলেন।

পুরনারীরা তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর দিলেন—আমার যদি কোন মূল্য থাকে তবে আমার স্বামী নিজেই আমার নিকটে আসিবেন।

বুদ্ধকে যাইতে হইয়াছিল। রাহুলমাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসনে বসিতেই তিনি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধোদন বুদ্ধকে বলিলেন যে যেদিন সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন সেইদিন হইতে রাহুলমাতা সকল প্রকার আমোদ ও বিলাস ত্যাগ করিয়াছেন, যেদিন শুনিলেন স্বামী কেশচ্ছেদন করিয়াছেন, ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে তিনিও অনুরূপ কার্য করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছেন।

বুদ্ধ এতটা প্রত্যাশা করেন নাই।

মহাপ্রজাবতীর আত্মবিস্মৃতি ও রাহুলমাতার আত্মসম্মানবোধ দুই-ই তাঁহাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল।

ইহার পর তাঁহার সঙ্ঘজীবন।

বৌদ্ধ ধর্মানুমোদিত জীবনযাপনের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তিনি

সঙ্ঘ স্থাপন করিতে লাগিলেন। নারীদের সঙ্ঘ-প্রবেশের নিয়ম ছিল না। নারীদের সঙ্গ তিনি সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন এবং শিষ্যদেরও চলিতে উপদেশ দিতেন। একদিন কিন্তু অঘটন ঘটিয়া গেল। বুদ্ধ বৈশালীতে মহাবনের কূঠাগারশালায় বাস করিতেছিলেন, সহসা আনন্দ আসিয়া খবর দিল যে কূঠাগারশালার দ্বারদেশে বহু নারী-সমাগম হইয়াছে। স্বয়ং মহাপ্রজাবতী আসিয়াছেন। তিনি চীবর-পরিহিতা ও ছিন্নকেশা। তাঁহার সঙ্গে অভিজাতবংশীয়া অনেক শাক্যরমণীও আছেন। তাঁহারা সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অনুমতি চান। বুদ্ধ বলিলেন—না আনন্দ, তাহা হইতে পারে না। শুনিয়া সমস্ত রমণীরা রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কপিলবাস্তু হইতে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন, মহাপ্রজাবতীর পা ফুলিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, অভিজাতবংশীয়া শাক্যনারীরাও শ্রান্তক্লান্ত, বিক্ষতপদ—তাঁহারা এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন শুধু সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি-আশায়। অনুমতি মিলিবে না? সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলের আগ্রহাতিশয্যে বুদ্ধকে অবশেষে অনুমতি দিতে হইয়াছিল। নারীরা সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছিলেন। অনুমতি দিয়াই কিন্তু বুদ্ধের মনে হইয়াছিল যে ভুল করিলাম। আনন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন—স্ত্রীলোকেরা যখন সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি পাইল তখন এই সদ্ধর্ম ৫০০ বৎসরের বেশি স্থায়ী হইবে না। যেমন উত্তম ধান্যক্ষেত্রে ছাতাপড়া, সেতট্‌ঠিকা রোগ লাগিলে সে ক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না, যেমন উত্তম ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্‌জেট্‌ঠিকা নামক রোগ লাগিলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, সেইরূপ যে ধর্মনিয়মে স্ত্রীলোকদের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় তাহাও চিরস্থায়ী হয় না।

অনুমতি দিবার পর কিন্তু নারীদের সংস্রব তিনি আর পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্যাধকন্যা চাঁপা হইতে শুরু করিয়া, শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা বিশাখা, অনাথপিণ্ডদসূতা সুপ্রিয়া, চুল্ল সুভদ্রা, কৃশা গৌতমী, সুজাতা, চৌরবধূ ভদ্রা, কুণ্ডলকেশা, বৈশালীর গণিকা

আম্রপালী (বা অম্বপালী), বাগ্মিনী নন্দুত্তরা প্রভৃতি অনেক রমণীই তাহার পর ভগবান বুদ্ধের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন গৃহস্থ রমণী নিমন্ত্রণ করিলেও বুদ্ধ তাহা আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার এরূপ বহু কাহিনী উল্লিখিত আছে। রাজগৃহের দাসী পুণ্যার পোড়া রুটিও তিনি সানন্দে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া বহু নারী যে আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার অজস্র প্রমাণ আমরা "থেরীগাথা" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই। সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি দিয়া বুদ্ধ সে যুগের সভ্য নারীসমাজে একটা আন্দোলনই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজকাল "কমরেড" হওয়া যেমন একটা গৌরবজনক ফ্যাসান, ইয়োরোপে 'Nun' এবং 'Sister' হওয়া যেমন এককালে মহীয়সী মহিলাদের সদগতি ছিল, বৌদ্ধযুগেও ঠিক তেমনি 'ভিক্ষুণী' হওয়া নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে আদৃত হইত। বহু পুণ্যাত্মা রমণীর সংস্পর্শ বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্মকে যে অলঙ্কৃত করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু স্ত্রীলোকদের হাতে বুদ্ধকে লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছিল অনেক। দুই-একটা উদাহরণ দিতেছি। বুদ্ধের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য একবার চিঞ্চা মানবিকা নাম্নী এক ভ্রষ্টা যুবতীকে নিযুক্ত করে। সে বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে যাইবার ছুতায় প্রায়ই জেতবনে যাইত। কিছুদিন পরে তাহার সহিত বুদ্ধের নাম যুক্ত করিয়া তাহারা নানা কলঙ্ক রটাইতে আরম্ভ করিল। চিঞ্চা নিজেই বুদ্ধকে মিথ্যাবাদী ধর্মধ্বজী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইত। সুন্দরী নাম্নী আর একটি ব্রাহ্মণকন্যার সহিতও বুদ্ধের নাম অনুরূপ ভাবে জড়িত। সত্যকথা অবশ্য কিছুদিন পরেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। মাগন্দিরা নাম্নী আর এক ব্রাহ্মণকন্যাও বুদ্ধকে অনেক নির্যাতন করিয়াছিল। বসন-ভূষণে সাজিয়া সে বুদ্ধকে জয় করিতে গিয়াছিল—কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ফিরিয়া আসিল।

এ অপমান সে ভোলে নাই। পরে যখন কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন তাহাকে বিবাহ করে তখন রাজরাণী পদে অধিষ্ঠিতা মাগন্দিরা গুণ্ডা লাগাইয়া প্রকাশ্য রাজপথে ভগবান বুদ্ধকে অপমান করিয়াছিল।

সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি পাইয়া অনেক নারীই যে সেখানে গিয়া স্বেচ্ছাচার করিত তাহারও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে গিয়া তাহারা গোপনে সুরাপান পর্যন্ত করিত। বিশাখার অনুরোধে একবার সমাগতা কয়েকটি মহিলাকে উপদেশ দিতে গিয়া বুদ্ধদেব লক্ষ্য করিলেন যে তাহাদের এমন মত্তাবস্থা যে তাহারা টলিয়া পড়িতেছে।

সঙ্ঘে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনের নানা কুফলও তিনি জীবিত-কালেই দেখিয়া গিয়াছেন।

উৎপলবর্ণার কাহিনী, সুন্দর-সমুদ্রের গল্প, অনাথপিণ্ডদের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেমের ক্রিয়াকলাপ, সিরিমার আখ্যান প্রভৃতি পড়িলে মনে হয় নারীদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ জীবনে অনেক অশান্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

রূপসী জনপদ কল্যাণীর সম্মুখে একটি মায়াময়ী সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাকে এক সন্তানের মাতা, মধ্যবয়স্কা, বৃদ্ধা ও ব্যাধি-গ্রস্তাতে পরিণত করিয়া রূপযৌবনের অসারত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহাতে যেন তাঁহার বৃক্ষের মূলোচ্ছেদন করিয়া আগায় জল ঢালার মতো ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

অবশেষে তিনি ভিক্ষুণীদের রক্ষার জন্য নগরের মধ্যে ভিক্ষুণীবিহার বানাইয়া দিতে রাজা প্রসেনজিৎকে অনুরোধ করেন।

কুশীনগরের নিকটবর্তী শালবনে অন্তিমশয্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধ যখন আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন তখন হঠাৎ আনন্দ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—"স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?"

"আনন্দ, স্ত্রীলোকদের দিকে তাকাইও না।"

"যদি তাকাইতে হয় তবে আমরা কি করিব?"

"বাক্যালাপ করিও না।"

"যদি বাক্যালাপ করিতেই হয় কি করিব?"

"সাবধানে করিবে।"

স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ইহাই বুদ্ধের শেষ উপদেশ।

তবু একথা আমরা কিছুতে ভুলিতে পারি না যে অজাতশত্রুর মতো দুর্ধর্ষ রাজার বিরুদ্ধাচরণকে উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধপূজা করিতে গিয়া আপনার জীবন যে বিসর্জন দিয়াছিল সে একজন নারী—তাহার নাম শ্রীমতী।